বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

প্রসিদ্ধ হিন্দু মহিলাগণের

জীবনচরিত।

শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৭৮

নির্ঘণ্ট।

নাম		পৃষ্ঠা।
১।	মৈত্রেয়ী	১
২।	গার্গী	৩
৩।	মন্দোদরী	৬
৪।	তারা	৭
৫।	সীতা	৯
৬।	সাবিত্রী	১৩
৭।	দময়ন্তী	১৬
৮।	শকুন্তলা	২০
৯।	কুন্তী	২৪
১০।	দ্রৌপদী	২৯
১১।	গান্ধারী	৩৬
১২।	বিদ্যোত্তমা	৩৯
১৩।	লীলাবতী	৪২
১৪।	খনা	৪৫
১৫।	সঞ্জগতা	৪৯
১৬।	পদ্মিনী	৫৩
১৭।	তারাবাই	৫৬
১৮।	রূপমতী	৫৮
১৯।	দুর্গাবতী	৬০
২০।	যদুবাই	৬৩
২১।	অহল্যাবাই	৬৫
২২।	কৃষ্ণকুমারী	৭১
২৩।	রাণীভবানী	৭৩

ভূমিকা।

ভারতবর্ষেও যে অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সুশিক্ষিতা, বিদুষী, সৎসাহসসম্পন্না, ও স্বদেশহিতাকাঙ্ক্ষিণী বীরবধূগণ ছিলেন, ইহা সপ্রমাণ করণার্থ এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। ভারতবর্ষীয় রমণীগণ গ্রন্থ প্রণয়ন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ ও জীবনদান, এবং মোগল সম্রাটদিগের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াছেন। পূর্ব্বকীর্ত্তিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত টডের প্রসাদাৎ ভারতবর্ষীয় প্রধানা হিন্দুমহিলারা কীর্ত্তিমন্দিরে স্পার্টা দেশীয় বীরবধূগণ অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্তা হইয়াছেন।

যবন সম্রাটদিগের আধিপত্যের প্রারম্ভ হইতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এদেশীয় কামিনীদিগেরও অবনতি আরম্ভ হয়। তাঁহাদিগের দেখাদেখি আমরা মানবসমাজের অলঙ্কারস্বরূপা কামিনীদিগকে অন্তঃপুররূপ পিঞ্জরে অবরুদ্ধ করি। এক্ষণে আবার ইংরাজদিগের দেখাদেখি, আমরা সেই অবজ্ঞাত ও অবরুদ্ধ সংসার সরোবরস্থিত কমলিনী রূপিণী কামিনীদিগকে সমাদর, শিক্ষাদান ও পিঞ্জরমুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাবে এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, স্ত্রীজাতি সমাজের মূল। ইহাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত না করিলে আমাদের সমাজের যথোচিত মঙ্গল ও অভ্যুদয় হইবে না; এটী অতীব মঙ্গলের বিষয়, সন্দেহ নাই।

কেহ২ মনে করেন, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগের পূর্ব্বকালে যাদৃশ উন্নতি হইয়াছিল, তাদৃশ উন্নতি আর হইবে না। পূর্ব্বকালে এ দেশে যেরূপ গুণবতী কামিনীরত্ন ছিলেন, এক্ষণে সেরূপ নাই। এ কথা আমাদের বড়ই অসঙ্গত বোধ হয়। অতল জলধি কি কখনও রত্নশূন্য হইতে পারে? খনির গর্ভে

এখনও অনেক -মণি আছে, যত্নসহকারে তুলিয়া পরিমার্জ্জিত করিলেই হয়। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ ভারতবর্ষীয় স্ত্রীরা অন্যান্য দেশীয় কামিনীগণের ন্যায় সকল প্রকার মানসিক গুণেরই অধিকারিণী। যদি ইহাঁদিগকে যত্নসহ শিক্ষা দেও, এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও অনেক লীলাবতী, অহল্যাবাই ও পদ্মিনী প্রকাশ পাইতে পারেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীই তাহার সুদৃষ্টান্তস্থল।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয়দিগের স্ত্রী জাতির শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ যত্ন দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণের দুঃখের নিশা অবসান হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। কবে সেই দিন আসিবে, যখন হিন্দুমহিলারা পুনরায় গার্গীর ন্যায় প্রকাশ্য পণ্ডিত সমাজে উপস্থিতা হইয়া তর্ক বিতর্ক করিবেন?

রামায়ণ, মহাভারত, এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেল, কর্ণেল টডকৃত রাজপুতানার ইতিহাস ও কলিকাতা রিবিউ প্রভৃতি পুস্তক হইতে বীরাঙ্গনাগণের চরিত্রের সারভাগ সকল এই পুস্তকে সঙ্কলন করা গেল। পূর্ব্বকালে কবিগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি গান করিয়া রাজপুত যোদ্ধৃগণকে সমরে উৎসাহিত করিতেন, আমরাও স্বদেশীয় কামিনীগণের বিদ্যানুরাগ জন্মাইবার জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বগত ভগিনীগণের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া তাঁহারা যদি তাঁহাদের ন্যায় উন্নতি লাভ করিতে উৎসাহিনী হন, এবং তাঁহাদের পূর্ব্বগত ভগিনীগণের সম্বন্ধে ইউরোপীয় মহিলাগণের অদ্যাপি যে সকল ভ্রম আছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে তিরোহিত হয়, শ্রম সফল বোধ করিব।

ভবানীপুর
৫ই মার্চ্চ ১৮৭২।

গ্রন্থকারস্য।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

১। মৈত্রেয়ী।

মৈত্রেয়ী ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বৃহদরণ্যক উপনিষদে ইহাঁর বিষয়ে এক চমৎকার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাণপ্রস্থ্য অবলম্বন করিতে উৎসুক হইয়া, জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সম্মতি প্রার্থনা করত কহিলেন,—"মৈত্রেয়ি। আমি ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী হইতে অভিলাষী হইয়াছি, তোমার সম্মতি অপেক্ষা। আমার ইচ্ছা যে তুমি ও তোমার সপত্নী কাত্যায়নী আমার সম্পত্তির তুল্য অধিকারিণী হও।" মৈত্রেয়ী স্বামিসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক থাকা প্রযুক্ত, উত্তর করিলেন, "মহাশয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ড লাভ করিয়াও কি কেহ অমর হইতে পারে?" যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তর করিলেন;—"না, তাহা কখনই হইতে পারে না। ধনসম্পত্তি দ্বারা ঐহিক সুখ সমৃদ্ধি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু অমর হওয়া যায় না।" তাহাতে মৈত্রেয়ী বলিলেন, "আমার এমন সম্পত্তিতে প্রয়োজন নাই, আপনি আমাকে মুক্তিপথ জ্ঞাত করুন। আমি

জানি, আপনকার তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে।” যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীজাতির ধনবৈরাগ্য দৃষ্টে যারপর নাই বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তুমি আমার প্রাণসম প্রিয়তমা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছ; আমি পরমাহ্লাদিত অন্তঃকরণে তোমায় মুক্তিপথ জ্ঞাত করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক অবধান কর।” তাহাতে লেখা আছে, যাজ্ঞবল্ক্য বেদপ্রতিষ্ঠিত মুক্তির উপায় তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন।

উক্ত বিবরণ পাঠ করিযা কে না স্বীকার করিবে, যে মৈত্রেয়ী উচ্চমনা এবং ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত স্বামির সুযোগ্যা ভার্য্যা ছিলেন। অধিকন্তু উক্ত বিবরণ দ্বারা ইহাও সুপ্রমাণ হইতেছে, যে পুরাকালের জনগণ আপনাপন স্ত্রীদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এবং গুরুতর বিষয়েও তাঁহাদের অমতে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এমন কি, তাঁহাদিগের সাংসারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, বহুবিবাহরূপ কদর্য্য রীতি তৎকালেও প্রচলিত ছিল। সুপণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যের সুযোগ্যা মৈত্রেয়ীর যে কালে সপত্নী ছিল, অপরাপর ভামিনীগণের যে ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারে? এই নিষ্ঠুর পদ্ধতিনিবন্ধন আমাদের দেশের যে কতদূর পর্য্যন্ত অবনতি হইয়াছে, তাহা সমুচিত বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

২। গার্গী।

গার্গী বচক্রুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বিদুষী ও গুণবতী বলিয়া সুবিখ্যাত। বৃহদরণ্যক উপনিষদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য বিচারের বিবরণ লিখিত আছে। বিদেহাধিপতি জনক রাজার যজ্ঞ উপলক্ষে অনেক২ মান্য ব্রাহ্মণ কুরু ও পাঞ্চাল হইতে তদীয় সভায় সমবেত হয়েন। গার্গীও তথায় উপস্থিতা ছিলেন। রাজা অভ্যাগত পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে, তাহা অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া, সহস্র গাভী গোশালায় আনয়ন ও তাহাদের শৃঙ্গদেশ সুবর্ণমণ্ডিত করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ কুলোতিলক বুধগণ, আপনাদিগের মধ্যে যে কেহ ধর্ম্ম বিচারে জয়ী হইবেন, আমি তাঁহাকে সহস্র গাভী পারিতোষিক দিব।" তাহাতে সকলেই নিস্তব্ধ থাকাতে, যাজ্ঞবল্ক্য সমস্রব নামক জনৈক শিষ্যের প্রতি, গাভীগণকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলে, অন্যান্য পণ্ডিতগণ রোষ প্রকাশ করেন। তখন রাজপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্যকে ভর্ৎসনা করত বলিলেন, "বহু পণ্ডিতের এস্থলে শুভাগমন দেখিতেছি, অতএব আপনকার বিচারশ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ না করিয়া গাভীগণ লইয়া যাওয়া অন্যায়।" তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "মহাশয়, ক্রুদ্ধ হইবেন না! আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে সম্মত ও প্রস্তুত; কিন্তু গাভীলাভ করিতে অত্যন্ত স্পৃহা হওয়াতে তাহাদিগকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছি।” তখন, অভ্যাগত পণ্ডিতগণের মধ্যে পঞ্চজন ও গার্গী তাঁহার সহিত বিচার করিতে অগ্রসর হয়েন। ব্রাহ্মণ পাঁচ জন শীঘ্রই পরাস্ত হইলেন, কিন্তু গার্গীকে পরাভূত করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। তিনি এমন বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে সভাস্থ সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিলেন। পরিশেষে যদিচ গার্গী তাৎকালিক পণ্ডিতবরের সহিত বিচারে পরাজিতা হইয়াছিলেন, তথাপি অভ্যাগত সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সাধুবাদ দেন। আচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত গার্গীর আশ্চর্য্য বিচারের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কে না চমৎকৃত হইবেন? প্রাগুক্ত উপনিষদের দুই বৃহৎ অধ্যায়ে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিচারের বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণিত আছে।

উক্ত বিবরণ পাঠে প্রাচীন হিন্দুদিগের রীতিনীতির অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে হিন্দু মহিলাগণ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, তাহা গার্গীর বিবরণ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কি আশ্চর্য্য, পশুজাতি যে সময়ে আঢ্যব্যক্তিদিগের প্রধান সম্বলস্বরূপ ছিল, সেই অপেক্ষাকৃত অসভ্য সময়ের অঙ্গনাগণ অনায়াসে বিদ্যা অভ্যাস করিতেন, কিন্তু এক্ষণ-

কার সভ্য সময়ের নারীরা বিদ্যারসে অনেকেই বঞ্চি-
তা। পুরাকালে হিন্দু কামিনীগণ রাজসভায় যজ্ঞ
উপলক্ষেও উপস্থিতা হইতেন, কিন্তু বর্ত্তমানকালের
মহীলাগণ পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের সদৃশা, চিরকাল অন্তঃ-
পুরে কাল যাপন করেন। প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা
অধুনাতন পণ্ডিতদিগের ন্যায় মুদ্রাযন্ত্রসাহায্যে পুস্ত-
কাদি প্রকাশ করত আপনাপন মনোভাব ব্যক্ত করি-
তেন না; কিন্তু কোন মহৎ ক্রিয়া উপলক্ষে, বা রাজ
সভায়, নানা বিষয়ক মতামত প্রচার করিতেন। পর্ব্ব
বা যজ্ঞ উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে মহা২ পণ্ডিতগণ
সমুপস্থিত হইতেন। ধনী লোকেরা অভ্যাগত বুধগণকে
যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতেন। অন্যান্য দেশেও
পূর্ব্বে২ এই রূপ রীতি প্রচলিত ছিল। ইতিহাসবেত্তা-
গ্রগণ্য হিরদতস ওলিম্পিক্ গেম নামক যুনানীয় দেশীয়
মহা সমারোহ কালে তদীয় উৎকৃষ্ট ইতিহাসভুক্ত প্রবন্ধ
সকল পাঠ করত সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করিতেন
এবং ক্রিষ্টন নামক সুবিখ্যাত নাবিকও ইউরোপ খ-
ণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সময়ে বিচার করিতেন।
অদ্যাপি ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সধনব্যক্তিদিগের
আলয়ে উপস্থিত হইয়া বিচার করিয়া থাকেন, এবং
উপযুক্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু আক্ষেপের
বিষয় এই, গার্গীর ন্যায় কোন মহীলাকে এমত স্থলে
দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩। মন্দোদরী।

মন্দোদরী তামেল রাজ কুলোদ্ভবা ও লঙ্কাধিপতি রাবণের ভার্য্যা ছিলেন। ইঁহার রূপলাবণ্যের বিবরণ রামায়ণে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইনি কেবল রূপবতী ছিলেন তাহা নহে, সাতিশয় গুণ সম্পন্নাও ছিলেন। এই জন্যই বোধ হয়, প্রবল পরাক্রান্ত বীর-গর্ব্বপরিপূরিত রাবণ মন্দোদরীকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন ও প্রধানা মহিষী করিয়াছিলেন। মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের অনেক বীর সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে মেঘনাদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। কথিত আছে, যখন রাবণ অযোধ্যাধিপ রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী সীতাকে হরণ করিয়া অশোক বনে রাখিয়াছিলেন, মন্দোদরী নিজ ঔদার্য্য গুণে সর্ব্বদা সীতাকে সান্ত্বনা করিতেন, তাঁহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেন ও রাবণকে জানকীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাঁহাকে শৃঙ্খল মুক্ত করিতে প্রবৃত্তি দিতেন; কিন্তু দুষ্ট রাবণ কোন ক্রমেই তাঁহার কথা মানিতেন না।

মন্দোদরী স্বামির তুষ্টিসাধন জন্য অতীব বুদ্ধি নৈপুণ্য প্রকাশ করত চতুরঙ্গ, অথবা সাধারণ কথায় যাহাকে শতরঞ্চ বলে, সেই প্রসিদ্ধ খেলার সৃষ্টি করেন। চতুরঙ্গ;—অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চারিভাগে বিভক্ত সেনা। ঐ খেলাতে কাগজের অথবা কাষ্ঠের রণস্থল উপলক্ষ করিয়া মূর্ত্তিমান সেনা-

গণের সহিত তুই জনে ক্রীড়া ছলে তুমুল সংগ্রাম ক-
রিয়া থাকেন। শতরঞ্চ খেলা এক্ষণে প্রায় সকল সভ্য
জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সার উইলিয়ম জোন্স্
বলিয়াছেন, যে হিন্দুস্থানেই উহার প্রথম সৃষ্টি হয়,
এবং ভারতবর্ষস্থ পণ্ডিতেরা বলেন, মন্দোদরীই উহার
সৃষ্টি করেন। মোগলপাঠান নামক আর একটী খেলা
বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। উহাও বঙ্গ অঙ্গনাদিগের
বুদ্ধিকৌশলে সৃষ্ট। উহাতে মোগল ও পাঠান এ উ-
ভয় জাতীয় রণনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখন
মোগল, কখন বা পাঠান পরাজিত হয়েন।

মন্দোদরী রাবণের রণশায়ী হওনের পর অনেক
বৎসর জীবিতা ছিলেন। কথিত আছে যে রামসহায়
বিভীষণ রাবণের মৃত্যুর পর লঙ্কার আধিপত্য প্রাপ্ত
হইয়া মন্দোদরীকে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক নিজগৃহে
ভরণপোষণ করেন। মন্দোদরীও অদ্যাবধি পঞ্চ স্মর-
ণীয়া কন্যাগণের মধ্যে পরিগণিতা আছেন।

৪। তারা।

রামায়ণে উল্লিখিত তারার বিবরণ অতি মনো-
হর। তারা নামটী এদেশের অনেক স্ত্রীলোকের মনো-
নীত। বোধ হয়, তারা তামেল দেশীয় রাজকুলোদ্ভবা
ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মবিবরণ আমরা কিছুই জ্ঞাত
নহি। কর্ণাটের মহাবলিপুরস্থ বালি রাজার সহিত
তাঁহার শুভ বিবাহ হইয়াছিল। ইনি যে পরমাসুন্দরী

ও সদ্গুণালঙ্কৃতা ছিলেন, তাহা রামায়ণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অযোধ্যাপতি দশরথতনয় রামচন্দ্র যখন পিতৃ আদেশক্রমে অরণ্যবাসী হয়েন, বালির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, এবং তদীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের সহযোগে তিনি বালির প্রাণ নাশ করেন। বালি রাজার মৃত্যু সমাচার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্রেই তারা সখীগণ সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে রণস্থলে উপস্থিতা হইয়া মৃত স্বামির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন। কয়েক দিবসানন্তর রণজয়ী রাম সুগ্রীবকে নিজ অঙ্গীকার অনুসারে বালির রাজত্ব প্রদান করিয়া তারার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সুগ্রীব তারাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, এবং ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি তদীয় অনুরাগ বদ্ধমূল হয়। তারার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ২ জিজ্ঞাস করিতে পারেন, দেবরের সহিত পরিণয় কি রীতিবিরুদ্ধ ছিল না? না; উৎকল প্রদেশে অদ্যাপি উক্ত রীতি প্রচলিত আছে, সুতরাং তৎকালেও ছিল। প্রাচীন জাতির মধ্যে যিহুদিয়েরা আজি পর্য্যন্ত মূসার আদেশানুসারে নিঃসন্তান ভ্রাতৃবধূর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। বালি রাজার তারা বই আর কোন ভার্য্যা ছিল না; যদি থাকিত, তারার ন্যায় তাঁহারাও মৃতস্বামি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সময়ে উপস্থিতা হইতেন। ইহাতে বোধ হয় উৎকল প্রদেশে তৎকালে বহুবিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না।

৫। সীতা।

সীতা মিথিলাধিপতি জনকরাজনন্দনী। তাঁহার সদৃশ রূপলাবণ্যবিশিষ্টা ও সর্ব্বগুণযুতা কামিনী এদেশীয় মহিলাগণ মধ্যে বিরল। বোধ হয়, রমণীগণমধ্যে আর কাহাকেও তাঁহার সদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে, হয় নাই। জনক একমাত্র দুহিতাকে বিশেষ যত্নের সহিত লালন পালন করিতেন, এবং জানকী যেমন বয়সে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, তেমনি দিন২ তাঁহার বিমল মুখপদ্ম বিকশিত ও অসাধারণ গুণরাশি সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা দুহিতার এতাদৃশ রূপলাবণ্য দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মনে২ স্থির করিলেন; যে কোন বীরপুরুষ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। এইরূপ সংকল্প করিয়া নৃপতি এক বৃহৎ ও গুরুতর ধনুঃ আনয়ন করিলেন; এবং নানা দেশে প্রচারিত করিয়া দিলেন যে, যে কেহ এই ধনুঃ ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই জানকীর পাণিগ্রহণ করিবেন। রাজা ও রাজকুমারগণ এই বার্ত্তা শ্রবণ করত সুন্দরী সীতার করগ্রহণাভিলাষে মিথিলা নগরীতে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ করা দূরে থাকুক, তাহা উত্তোলন করিতেও পারিলেন না।

পরিশেষে মহাবীর রামচন্দ্র স্বীয় অনুজ লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইয়া

অনায়াসে সেই বিষম ধনুর্ভঙ্গ করত রূপগুণসুসম্পন্না জানকীকে অযোধ্যায় লইয়া যান। পিতা দশরথ ও জননী কৌশল্যা পুত্রবধূর মুখারবিন্দ দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইলেন। পরে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসারকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের মনস্থ করেন। রাজার প্রিয়তমা ভার্য্যা কৈকেয়ী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় স্বামীকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া, রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যে প্রেরণ ও তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় গর্ব্ভজাত ভরতকে সিংহাসন প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন।

রাম জনকের এই অঙ্গীকার পূরণাভিলাষে লক্ষ্মণ ও জানকীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করেন। প্রয়াগে যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিন্ধ্যাচলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাদেশ পর্য্যটন করত অবশেষে পঞ্চবটীর বনে কিয়ৎকাল যাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে দশরথ, হৃদয়নন্দন রামকে বিনাপরাধে বনবাস দেওয়াতে, অপার শোকসাগরে পতিত হইয়া, মানব লীলা সম্বরণ করেন।

রাজার মৃত্যুর অনতিবিলম্বে ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে পিতৃপরিবর্ত্তে রাজত্ব করিতে অনুরোধ করেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া অরণ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ অতি যত্নের সহিত সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে

এক জন মৃগয়ায় গমন করিলে, অন্য জন জানকীর নিকট থাকিতেন। একদা রাম যে দিগে মৃগয়া করিতে-গিয়াছিলেন, সেই দিগ হইতে ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হওয়াতে, লক্ষ্মণ তথায় গমন করেন। ইত্যবসরে দুর্বৃত্ত দশানন জানকীকে লইয়া পলায়ন করেন, এবং স্বীয় রাজধানী লঙ্কাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া অতি গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন।

রাম মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রিয়ার অদর্শনে অধীর হইয়া নানা স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লঙ্কাদ্বীপে সীতার অবস্থিতির বিবরণ অবগত হইয়া কর্ণাটাধিপতি বালিরাজার ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করেন, এবং তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হনূমানকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করতঃ সীতার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত রাবণের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু রাবণ রামের প্রস্তাবে মনোযোগ না করাতে হনূমান সীতাকে রামচন্দ্রের কুশল সমাচার প্রদান করিয়া কর্ণাটে ফিরিয়া আইসেন।

অনন্তর সুগ্রীব ও রাম বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামের পর রাবণকে হত করিয়া সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। কালক্রমে সীতা গর্ব্ভবতী হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা তৎসন্নিধানে থাকিতেন ও নানা সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ

করাইতেন। কিন্তু প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই সীতার সতীত্বের বিষযে সন্দিহান হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাহা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইলে, তিনি সীতাকে অরণ্যে প্রেরণ করেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে লইয়া চিত্রকূট সন্নিহিত প্রদেশে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে রাখিয়া আইসেন।

তথায় সীতা উপযুক্ত সময়ে লব ও কুশ নামে পরম রূপবান্ যমজ পুত্র প্রসব করেন। এই ঘটনার দ্বাদশবর্ষ পরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ঋষিবর বাল্মীকি লব ও কুশকে সমভিব্যাহারে করিযা যজ্ঞ দর্শনে আইসেন। তথায় রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করাতে অনেকেই সীতাকে প্রত্যানয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাম আনন্দে মহাসমারোহে ভার্য্যাকে রাজধানীতে আনাইলেন। কিন্তু প্রজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখনও অসন্তোষ প্রকাশ করাতে প্রজাবৎসল রাম সীতার পরীক্ষার প্রস্তাব করিলেন। সীতা এই অপমানজনক প্রস্তাবে মুর্চ্ছাগতা হইযা ভূতলে পতিতা হয়েন, এবং তখনই তাঁহার দেহ প্রাণশূন্য হয়।

রামচন্দ্র ভার্য্যার মৃত্যু দর্শনে একান্ত শোকাকুল হইযা, সরযূ নদীতে প্রাণত্যাগ করেন।

উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া কে না স্বীকার করিবেন, যে বহুবিবাহ রামচন্দ্রের অকারণ বনবাস প্রভৃতি নানা

অনর্থের মূলকারণ। যদি দশরথ বহুবিবাহরূপ গুরুতর দোষে দোষী না হইতেন, তবে কি সীতার এত অধিক দুর্দ্দশা হইত, না আপনিই অকালে কালকবলে পতিত হইতেন? বর্ত্তমান কালেও কৌলীন্য দূরীভূত হয় নাই। ইহা অতি লজ্জার বিষয়। জনহিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে সম্প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন, ভরসা করি কৃতকার্য্য হইবেন।

৬। সাবিত্রী।

সাবিত্রীর নাম এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক মাত্রেই জানেন। ইঁহার পিতার নাম অশ্বপতি। অশ্বপতি রাজার সাবিত্রী ভিন্ন আর কোন সন্তান সন্ততী ছিল না, এই জন্য সাবিত্রী রাজা ও রাণীর অত্যন্ত স্নেহপাত্রী ছিলেন। যৌবনকালে একদা সাবিত্রী তপোবনে মুনিপত্নীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ গমন করেন। তথায় পরম রূপবান এক যুবককে দেখিয়া এককালে বিমোহিত হন। সেই যুবকের রূপে সাবিত্রী এতাদৃশ মুগ্ধ হন যে তখনি তাঁহাকে মনেং পতিত্বে বরণ করেন। অনন্তর মুনিপত্নীদিগের নিকট উক্ত যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যথাসময়ে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া মাতার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করেন। রাণীর প্রমুখাৎ রাজা এই কথা অবগত

হইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন; এবং সাবিত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, "অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে সহসা অন্তঃকরণে স্থান দান করা তোমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে; সম্প্রতি তুমি সে চিন্তা পরিত্যাগ কর।" পিতার কথায় সাবিত্রী অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "পিতঃ, যাঁহাকে একবার মন সমর্পণ করিয়াছি, প্রাণ থাকিতে তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, নিশ্চয় জানিবেন, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। তাঁহার আকৃতি অবলোকন করিলে তাঁহাকে রাজকুলোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়।" ইত্যবসরে নারদ মুনি উপস্থিত। রাজা যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয, সাবিত্রী সে দিবস তপোবনে মুনিপত্নীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এক যুবাপুরুষকে দেখিয়া আসিয়াছে, নিতান্ত ইচ্ছা, তাঁহাকেই বিবাহ করে। ইহাতে আপনার মত কি?" তখন নারদ সাবিত্রীকে কহিলেন, "বৎসে, তুমি সেই যুবাপুরুষকে বিস্মৃত হও, তাঁহাকে বিবাহ করিলে পরিণামে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে।" "মুনিবর, আমাকে ক্ষমা করুন। সেই যুবককে বিবাহ করিয়া যদি চিরকাল দুঃখসাগরে ভাসিতে, বৃক্ষতলে বাস এবং বনফল সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইব না। একবার মনে২ যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি,

কোন মতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। আমি আবার বলিতেছি, তিনিই আমার স্বামী।"

তখন নারদ কহিলেন, "যে কারণে আমি সেই যুবককে বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেছি, শুন। সেই যুবকের নাম সত্যবান। সূর্য্যবংশ সম্ভূত রাজা দ্যুমৎসেন তাঁহার পিতা। দ্যুমৎসেন অবন্তিদেশের রাজা ছিলেন। পীড়ানিবন্ধন হঠাৎ অন্ধ হওয়াতে শত্রুগণ রাজ্য অপহরণ করিয়া লয়; সুতরাং রাজা সস্ত্রীক অরণ্যবাসী হইযাছেন। সত্যবান রূপগুণে বাস্তবিক তোমার উপযুক্ত,তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু গণনা করিয়া দেখিলাম, বিবাহের দিবসাবধি এক বৎসর পূর্ণ হইলেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে, অতএব কি প্রকারে তোমাকে বৈধব্য যন্ত্রণাভোগ করিতে বলিতে পারি? আমার আপত্তির কারণ এই। এখন যাহা ইচ্ছা কর।" উক্ত গুরুতর আপত্তি সত্ত্বেও সাবিত্রী সত্যবানকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু ও পুনর্জীবনের বৃত্তান্ত মহাভারতে লিখিত আছে। কিন্তু ঊনবিংশতি শতাব্দীতে কেহ তাহা বিশ্বাস করেন না। অরণ্যবাসী রাজপুত্রকে কন্যা দানে রাজা ও রাণী স্বভাবতই অসম্মত ছিলেন; বোধ হয়, এই কারণেই নারদ মুনি ঐরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করেন। চিত্তের স্থিরতা, প্রেমের দৃঢ়তা এবং পতিব্রতাধর্ম্ম, স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক ভূষণ। সাবিত্রী রাজার

কন্যা হইয়াও পিতা, মাতা ও কুলগুরু নারদের কথা অগ্রাহ্য করতঃ এক বৎসর পরে নিশ্চয় বিধবা হইতে হইবে, জানিয়াও বনবাসী সত্যবানকে বিবাহ করিয়া দৃঢ় প্রেমের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

৭। দময়ন্তী।

বিদর্ভ দেশে ভীম সেন নামে এক রাজা ছিলেন। দময়ন্তী তাঁহার কন্যা। দময়ন্তী পরম সুন্দরী ও গুণবতী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সেই সময়ে নৈষধ দেশে নল নামে এক রাজা বাস করিতেন। সখীগণ দময়ন্তীর সাক্ষাতে সচরাচর নলরাজার রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিত। তাহা শুনিতে শুনিতে দময়ন্তীর মন নলের প্রতি অনুরক্ত হয়। ভীমসেন ইহা জানিতে পারিয়া নলকে বিবাহ করিতে বিস্তর নিষেধ করেন। সেই সময়ে এক দিন দময়ন্তী বলিয়াছিলেন, "হয় নল, না হয় অনলকে আলিঙ্গন করিব।"

তৎকালে ভারতবর্ষে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। ভীমসেন দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিলেন। দিন স্থির হইল। দেশের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল। নিয়মিত সময়ে বিবাহার্থী রাজগণ স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইলেন। নানা অলঙ্কারে বিভুষিতা দময়ন্তী বরমাল্য হস্তে করিয়া, সভায় গমন করিলেন। পূর্ব্বসাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা দময়ন্তী নলরাজাকে চিনিতে পারিয়া

তাঁহারই গলায় বরমাল্য প্রদান করেন। তাহাতে অন্যান্য রাজগণ নলরাজার শত্রু হইয়া উঠিলেন।

পুষ্কর নামে নৈষধরাজের এক ভ্রাতা ছিলেন। একদা তাঁহার সহিত নলরাজার পাশা খেলা হয়। সেই দ্যূতক্রীড়াতে নলরাজা রাজ্য হারিয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সস্ত্রীক বন গমন করেন। বনে যাইবার সময় দময়ন্তীকে পিতৃভবনে রাখিয়া যাইবার নলের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই তাহাতে সম্মতা হইলেন না। সীতার ন্যায় তিনি স্বামির সঙ্গিনী হইলেন। যাইতে২ উভয়ে জনশূন্য অরণ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। দুঃখসাগরে পতিত হইলে কত বহুদর্শী ও সাহসী মনুষ্যেরও বুদ্ধির ভ্রম উপস্থিত হয়। নলরাজারও সেইরূপ হইল। তিনি দুঃখে অভিভূতপ্রায় হইলেন। সেই দুঃখসাগরে দময়ন্তী তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। দময়ন্তীর বিহঙ্গনিন্দিত সঙ্গীতমধুর স্বর নলরাজার দুঃখনিপীড়িত অন্তঃকরণে কথঞ্চিৎ সুখোৎপাদন করিত। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, শেষে তিনি দময়ন্তীকেও হারাইলেন। এক দিন তিনি কোন পক্ষীর অনুসরণ করিতে২ দূরবনে গমন করেন। দময়ন্তী এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। নল এত দূরে গিয়া পড়িলেন যে সেই নির্ণীত স্থানে আসিতে পারিলেন না। তাঁহার পথভ্রান্তি হইল; তিনি আরও দূরে যাইয়া

পড়িলেন। নলকে না দেখিয়া দময়ন্তী কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি প্রভাত হইল। পূর্ব্বদিকে সিন্দূরের ফোঁটার ন্যায় প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইল, তবুও নলের দেখা নাই। দময়ন্তী কাঁদিতেছেন—ভাবিতেছেন, বুঝি রাজা কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হইয়া থাকিবেন, নতুবা আইসেন না কেন? কিন্তু স্নেহপ্রবণচিত্তে নিধনাশঙ্কা অধিক কাল স্থান পায় না। নানাবিধ চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, নলের চিন্তাতেই ব্যাকুলা। পাঠক, প্রবল ঝড়ের সময় সমুদ্রে কাণ্ডারীবিহীন তরি দেখিয়াছ? দময়ন্তী সেই তরি ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিন দিন গত হইলে, দময়ন্তী এক মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিতা হইলেন। মুনি তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং সবিশেষ অবগত হইয়া বলিলেন, "বৎসে, অপার দুঃখে পড়িয়াছ, সত্য; কিন্তু দুঃখ কখনও স্থায়ী হয় না। বর্ষাকালে চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু চন্দ্রের দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য ঈশ্বর বর্ষাঋতুকে একাধিপত্য দান করেন নাই; শরৎকালে শশী পরম সুখী, অতএব তোমার দুঃখ অধিক কাল থাকিবে না। তোমার সুখরূপ শরৎকালের আগমনের আর বিস্তর বিলম্ব নাই। ধর্ম্ম অবলম্বন কর। পুনরায় পতিসহ মিলিত হইবে। পু-

নরায় তোমরা নৈষধের রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিবে।” দুঃখী ব্যতীত সান্ত্বনাবাক্যের মূল্য আর কেহ জানে না। মুনির বাক্যে দময়ন্তীর উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ কথঞ্চিৎ নিবারিত হইল। পরে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, সুবাহু নগরে যাইয়া উপস্থিতা হইলেন। কথিত আছে, সেই নগরে দময়ন্তী সৈরিন্ধ্রীবেশে কোন গৃহস্থের বাটীতে কিছু কাল যাপন করেন। পরে পিতা ও ভ্রাতৃগণ উদ্দেশ পাইয়া তাঁহাকে তথা হইতে আপনাদের বাটীতে লইয়া যান। এই ঘটনানন্তর নলরাজারও উদ্দেশ পাওয়া যায়, এবং তাঁহাকেও বিদর্ভ নগরে আনয়ন করা হয়। দময়ন্তী নলের দর্শন পাইয়া সকল দুঃখ বিস্মৃতা হইলেন। ভাগ্যক্রমে আর এক দিন পুষ্করের সঙ্গে পুনরায় পাশা খেলা হওয়াতে নল জয়ী হইয়া সমস্ত রাজ্য পুনর্লাভ করেন। সেই অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাদের আর কোন বিশেষ বিপদ ঘটে নাই।

নলদময়ন্তী কাব্যে অনেক অসম্ভব কথা লিখিত আছে। আমরা সে সকল ত্যাগ করিয়া উপাখ্যানের সারভাগ মাত্র গ্রহণ করিলাম। দময়ন্তী কামিনীকুলের আদর্শ; পতিপরায়ণতা এবং পতিহিতৈষিতার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। ইনি পতিদুঃখে দুঃখিনী হইয়া বনে গমন, এবং সৈরিন্ধ্রীর বেশে গৃহস্থের বাটীতে দুঃখে কাল যাপন করেন। দুঃখ এমন পদার্থ যে তাহার

আঘাতে সহস্র সহস্র লোকের দৃঢ় প্রেম চঞ্চল হইয়া পড়ে। কিন্তু এস্থলে উহা কিছুই করিতে পারে নাই। স্বামির জন্য দময়ন্তীর ন্যায় দুঃখ অতি অল্প স্ত্রীলোকেই ভোগ করিয়াছেন।

৮। শকুন্তলা।

শকুন্তলার বিবরণ অনেকেই জানেন। কবিবর কালিদাসরচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে শকুন্তলার জীবনচরিত চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। হরিদ্বার সমীপস্থিত মালিনী নদীতীরস্থ আশ্রমবাসী ধর্ম্মপরায়ণ কণ্বমুনি শকুন্তলাকে প্রতিপালন করেন। মহাভারতে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। এই বিবরণ সত্য হউক বা না হউক, কণ্বমুনি বাস্তবিক শকুন্তলাকে কন্যাবৎ স্নেহ করিতেন ও অতি যত্নে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। শকুন্তলার রূপও যেমন গুণও তদ্রূপ ছিল; সুতরাং তিনি সহজেই প্রতিবেশবাসিনী মুনিকন্যাগণের সাতিশয় স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। মুনিবর ত তাঁহাকে ভাল বাসিতেনই; অন্যান্য সকলে, এমন কি, যাঁহারা তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিতেন, তাঁহারাও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। কালসহকারে শকুন্তলা রমণীয় কান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। পিতৃপালিত গাভী, হরিণ প্রভৃতি পরমসুখে লালন পালন করিতেন। পুষ্পকাননেরও

সেবা করিতেন। সরলহৃদয়া সখীগণের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে পরমহর্ষে তাঁহার কালাতিপাত হইত। একদা হস্তিনাপুরের প্রবল পরাক্রান্ত দুষ্মন্ত রাজা মৃগয়ার্থ গমন করিতে করিতে হঠাৎ কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েন। মুনি তৎকালে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং শকুন্তলা রাজার প্রতি অথীতিসৎকার করিতে আইসেন। রাজা শকুন্তলার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে একেবারে বিমোহিত হয়েন। শকুন্তলারও অন্তঃকরণে দুষ্মন্তের প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মে। এমন কি, উভয়েই উভয়ের সৌন্দর্য্যে ও কথোপকথনে বিমুগ্ধ হযেন। তাহাতে রাজা শীঘ্র নিজ পরিচয় প্রদান করতঃ গান্ধর্ব্ববিধানানুসারে শকুন্তলার পাণি গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। গান্ধর্ব্ববিবাহে স্ত্রী পুরুষের সম্মতি হইলেই যথেষ্ট ; কোন বাহ্য আচারের আবশ্যক করে না। হিমালয় সমীপস্থিত পর্ব্বতবাসী গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে উক্তরূপ বিবাহরীতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়দিগের অবৈধ প্রণয়কলঙ্ক বিদূরিত করণাভিপ্রায়ে মনুও গান্ধর্ব্ববিবাহ ব্যবস্থাসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাজার প্রস্তাবে শকুন্তলা অগত্যা সম্মতা হইলেন। পরে ধর্ম্মারণ্যে কিয়দ্দিবস মুনিকন্যার সহবাসে অতিপাত করিয়া হস্তস্থিত স্বনামমুদ্রিত অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক রাজা শকুন্তলার নিকট বিদায় লইয়া রাজধানীতে যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে

বলিয়া গেলেন, অনতিবিলম্বে তাঁহাকে লইয়া যাইতে লোক পাঠাইবেন; কিন্তু পাঠান নাই। ইত্যবসরে কণ্ব-মুনি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে শকুন্তলার বিবাহের সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেই গুরুতর ব্যাপার সমাধা হইয়াছে বলিয়া তিনি রুষ্ট হইলেন না, বরং দুষ্মন্ত রাজার সহিত বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া সন্তুষ্ট ও গর্ভবতী যুবতী কন্যাকে অবিলম্বে স্বামিসদনে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অনন্তর কয়েকজন বিশ্বাসপাত্র সমভিব্যাহারে কন্যাকে হস্তিনানগরে পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে স্নানকালে রাজদত্ত অঙ্গুরীয় নদীজলে পড়িয়া গেল। শকুন্তলা পতির সহিত পুনর্ম্মিলনের সুখচিন্তায় এমনি বিহ্বলপ্রায় হইয়াছিলেন যে তাহা জানিতে পারিলেন না। রাজভবনে উপস্থিতা হইয়া পাণিগ্রহণ চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিতে অক্ষম হওয়াতে রাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। ইহা কেবল ছলনা মাত্র। বোধ হয়, কণ্বমুনির সময়ে আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে পূর্ব্বকালের ন্যায় কেহ সম্মান করিতেন না। পূর্ব্বে ঋষিগণ যাজকতা ও রাজকর্ম্ম উভয় কার্য্যই সমাধা করিতেন। তখন মহর্ষিগণের অভিমানের পরিসীমা ছিল না। তৎপরে গর্ব্বিতহৃদয় ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের যাজকতার কোন প্রতিবন্ধকতা করেন নাই বটে, কিন্তু আপনারাই রাজকার্য্য প্রভৃতি করিতেন। সুতরাং

ব্রাহ্মণেরা কেবল বেদ অধ্যয়ন, ও যাজকতায় নিযুক্ত থাকিতেন। এমন অবস্থায রাজা যে কোন ঋষি-কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, তাহা সম্ভব হয় না। এই জন্যই বোধ হয়, দুষ্মন্ত জানিয়া শুনিয়া শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করেন। অপমান ভয়েই হউক, আর অঙ্গুরীয না দেখিয়াই হউক, রাজা শকুন্তলাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে, তিনি নিকটস্থ অরণ্যমধ্যে গমন করেন। তথায় যথা সময়ে শকুন্তলার ভরত নামক এক পুত্র জন্মে। ভরতের বীরত্বের বর্ণনা করা বাহুল্য। এমন কিম্বদন্তী যে তিনি শৈশবাবস্থায সিংহশাবকদিগের মুখব্যাদান পূর্ব্বক শিশুভাষায় আধ২ স্বরে কহিতেন, "হলা সিংহশাবক দন্তান্ বিথ্যালয়।" ভরতের পাণ্ডিত্য ও বীরত্ব অবিলম্বেই রাজকর্ণগোচর হইল। রাজা একেই শকুন্তলা পরিত্যাগ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে আবার সন্তানের সুখ্যাতি শ্রবণ করিলেন। সুতরাং তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে নদীতীরে পতিত স্বনামমুদ্রিত অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তখন আর ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া শকুন্তলার সহিত তাঁহার গুপ্তবিবাহ সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন করেন। শকুন্তলা রাজার পাটেশ্বরী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি

রমণীয় ছিল। বনমধ্যে ধর্ম্মাশ্রমে প্রতিপালিতা শকু-ন্তলা মিথ্যা চাতুরী কিছুই জানিতেন না। সতত বিদ্যা-লোচনা ও গুরু জ্ঞানে স্বামী সেবা করিতেন। তাঁ-হার গর্ব্ভজাত সন্তান ভরত, উত্তর ভারতবর্ষের অধী-শ্বর হইয়াছিলেন। ভরত হইতে হিন্দুস্থানের "ভা-রতবর্ষ" নাম হইয়াছে।

শকুন্তলার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা এই শিক্ষা লাভ করি, যে সহসা কোন কর্ম্ম করা ভাল নয়। শকুন্তলা যদি গুরুজনের অজ্ঞাতসারে দুষ্মন্তের প্রণয়-পাশে বদ্ধা না হইতেন, তবে কি তাঁহাকে পূর্ব্বো-ল্লেখিত অকথনীয় যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করিতে হইত? কখনই নহে। উক্ত বিবরণ হইতে আমরা আর একটী উপদেশ প্রাপ্ত হই;—অযোগ্য প্রণয় অনুচিত। দরিদ্রা, আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার পক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত দুষ্মন্ত রাজাকে পাণিদান করা অবিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার নানাবিধ ক্লেশ ঘটে।

৯। কুন্তী।

রোমীয়দিগের কর্ণিলিয়া যেমন, আমাদিগের কু-ন্তীও তেমনি খ্যাতাপন্না ছিলেন। গ্রেকাইয়ের জননী পাণ্ডবজননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন না। কর্ণিলিয়ার

স্মরণার্থ রোমীযেরা এক প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিযাছিলেন, কুন্তী পঞ্চস্মরণীযা কন্যার মধ্যে অদ্যাপি পরিগণিতা আছেন। মহাভারতে লিখে, প্রাচীন মথুরার অধিপতি শূররাজার ঔরসে কুন্তীর জন্ম হয়। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব কুন্তীর ভ্রাতা ছিলেন। বিন্ধ্যাচলের কুন্তীভোজ নামে কোন এক রাজাকে শূররাজ কুন্তীকে পোষ্যপুত্রীস্বরূপ প্রদান করেন। উক্ত বিবরণ সত্য কি মিথ্যা, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। পূর্ব্বকালের হিন্দু রাজবংশের নামাবলী মধ্যে কুন্তীভোজ নাম দুষ্প্রাপ্য, এবং কন্যা সন্তানকে পোষ্যপুত্রী বরাং রীতিবিরুদ্ধ। এই জন্যই বোধ হয়, উক্ত বিবরণ অযথার্থ হইবে। হস্তিনা নগরের প্রবল প্রতাপান্বিত সুবিখ্যাত চন্দ্রবংশোদ্ভব পাণ্ডুরাজ কুন্তীর পাণি গ্রহণ করেন। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে পাণ্ডুর তিন পুত্র জন্মে। মাদ্রী নাম্নী আর এক ভার্য্যার গর্ভজাত নকুল ও সহদেব নামে তাঁহার আর দুই পুত্র ছিল। এই পঞ্চ পুত্র ভারতবর্ষে পঞ্চ পাণ্ডব নামে বিখ্যাত আছেন। পাণ্ডুরাজ আশ্চর্য্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নানা দেশ জয় করতঃ অনেক কাল পরম সুখে রাজত্ব করেন। পরে পূর্ব্ব প্রথানুসারে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে হিমালয়সমীপস্থিত অরণ্য মধ্যে বাস করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে কুন্তী পুত্রদিগকে

সঙ্গে লইয়া হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করেন। ধৃত-রাষ্ট্র ভ্রাতৃবধূকে অত্যন্ত সমাদরপূর্ব্বক নিজগৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত করণাভিপ্রায়ে কুন্তী যৎপরোনাস্তি মনোযোগ করিতেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কুন্তী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন; তাঁহার সদুপদেশে যে পাণ্ডবদিগের সাতিশয় জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। রাজপুত্রগণ এক সঙ্গে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইতেছেন, এক গৃহে বাস করিতেছেন, একত্রে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, তথাপি—কি আশ্চর্য্য পাপবিদূষিত মানবপ্রকৃতি!—তাঁহাদিগের মধ্যেও ক্রমশঃ ঈর্ষ্যাভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। কৌরবদের ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত পাণ্ডবেরা বনবাসী হইতে বাধ্য হয়েন। কুন্তীও তাঁহাদিগের সহিত অরণ্যের দুর্ব্বিসহ ক্লেশ সহ্য করেন। বারণাবত অর্থাৎ প্রয়াগ নগরে উপস্থিত হইলে কৌরবেরা তাঁহাদিগকে সংহার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তৎপরে তাঁহারা একচক্র অর্থাৎ আরা নগরে জনৈক ব্রাহ্মণের আশ্রমে কিয়ৎকাল যাপন করেন। এস্থলে বাস করিতে করিতেই ভীম নিজ বাহুবলে রাক্ষস বকাসুরের প্রাণ সংহার করেন। একচক্র হইতে পঞ্চাল রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবাহ করণাভিপ্রায়ে পাণ্ডবেরা পঞ্চাল

দেশে গমন করেন। কুন্তী তাঁহাদিগের সঙ্গে যান নাই, রাজপুরোহিতের বাটীতে অবস্থিতি করিযাছিলেন। পরে মৎস্যচক্র ভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করতঃ পঞ্চভ্রাতা কিয়ৎকাল কম্পিলায় যাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র লোক পাঠাইয়া পাণ্ডবদিগকে হস্তিনা নগরে লইয়া যান। কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে পিতৃরাজ্য হইতে দূরীকৃত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু কুন্তী বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত এবার আর সন্তানগণের সমভিব্যাহারে গমন করিতে না পারাতে বিচিত্রবীর্য্যের ক্রীতদাসীর গর্ভজাত পুত্র বিদুরের গৃহে তাঁহাকে রাখিয়া পাণ্ডবেরা অরণ্যে গমন করেন। কাল সম্পূর্ণ হইলে তাঁহারা কৃষ্ণের দ্বারা কৌরবদিগের নিকট পিতৃরাজ্য চাহিয়া পাঠান। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের সভায় উপস্থিত হইয়া বোধ হয়, পিতৃষ্বসা কুন্তীর সহিতও সাক্ষাৎ করেন। তাহাতে ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া কুন্তীর তাপিত হৃদয় কথঞ্চিৎ শীতল হয় বটে, তথাপি তাদৃশ দুঃখানল সহজে নির্ব্বাণ হইবার নহে। সুতরাং আত্মীয়সমীপে অনেক আক্ষেপ ও রোদন করিলেন। কৃষ্ণ যার পর নাই দুঃখিত হইয়া, রাজ্ঞীকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইযাছিলেন, এবং, বোধ হয়, কুন্তীর এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়াই তিনি ত্বরায় সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপলক্ষে কুন্তী

সন্তানদিগকে যে সমস্ত সৎসাহস ও সদ্বুদ্ধি-পরিপূরিত উপদেশ দান করেন, তাদৃশ চমৎকার সময়োচিত উপদেশ অতি বিরল। "ব্যাধ যেমন শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করে এবং অভিলষিত কাল উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ মৃগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করে, তোমরাও তদ্রূপ আগ্রহপূর্ব্বক পিতৃ-রাজ্যলাভার্থ যুদ্ধ কর। বৈরিগণের সম্ভ্রম, পরাক্রম বা সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। সিংহাসন অধিকার চেষ্টা কর। তোমরা ক্ষত্রিয়, সুতরাং কৃষিকার্য্য বা বাণিজ্য করিতে অথবা ভিক্ষাজীবী হইতে অক্ষম; অস্ত্রচালনা ও শর নিক্ষেপ করা তোমাদিগের যথার্থ ধর্ম্ম। হয় বৈরনির্য্যাতন কর, নয় সমরক্ষেত্রে বিনষ্ট হও; সম্ভ্রমের সহিত প্রাণ হারাণ, অবমাননার সহিত জীবনধারণ করা অপেক্ষা সহস্রাংশে লোভনীয়। তোমরা যে পাণ্ডু-ঔরসজাত, তাহা সপ্রমাণ করণের শুভকাল উপস্থিত, অতএব কুন্তীগর্ভে যে উপযুক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা জানাইয়া মাতৃমুখ উজ্জ্বল কর। কিন্তু কেবল আমার কথাই বলি না, দ্রৌপদীর কলঙ্ক দূর কর। রাজসভায় তাঁহার অপমান কি বিস্মৃত হইয়াছ? তৎকালেই তাহার প্রতিবিধান করা তোমাদিগের উচিত ছিল। ভাল, তখনও যদি না করিয়া থাক, এক্ষণে কর, নতুবা কাপুরুষদিগের জীবন ধারণে

রাজার প্রয়োজন কি?” স্পার্টার ভামিনীগণ সন্তান-দিগকে বলিতেন, “হয় খড়্গ লইয়া সগর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে, নতুবা রণস্থলে উহার উপর শয়ান থাকিবে। দেখ, যেন, কখন পলায়ন না কর।” কুন্তীর উপদেশ পাঠ করিয়া উক্ত কথা কাহার না স্মরণ পথে আইসে? আর্য্য বংশোদ্ভব রমণীমাত্রেরই পুরাকালে সমরূপ সাহস ও বীরত্ব ছিল। হায়, এক্ষণকার অব-লাগণ যথার্থই অবলা হইয়াছেন। কত দিনে ভারত বর্ষের এই দুর্গতি দূর হইবে। পাণ্ডবেরা রণজয়ী হইলে, কুন্তীর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। রাজ-সিংহাসনে সন্তানদিগকে আরূঢ় দেখিয়া কোন জননীর মনে না সুখোদয় হয়? যুধিষ্ঠিরকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ হইলে কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত হস্তিনা নগর পরিত্যাগ করতঃ গঙ্গাতীরে বাস করেন। এরূপ কিম্বদন্তী যে তথায় প্রবল দাবানলে বনবাসী সমস্ত পরিজনগণের সহিত কুন্তী বিদগ্ধ হয়েন। কুন্তীর বীরত্ব যেমন ছিল, ধর্ম্মপরায়ণতা তেমন ছিল না। অনূঢ়া অবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে কর্ণ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সে যাহা হউক, অনেক বিষয়ে কুন্তী নারী-কুলের অলঙ্কার।

১০। দ্রৌপদী।

দ্রৌপদীর বিবরণ অতি চমৎকার। ইনি হস্তিনা

নগরের দক্ষিণ পশ্চিম স্থিত পঞ্চাল দেশাধিপতি দ্রুপদ নামক ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা। দ্রৌপদী পরমাসুন্দরী ছিলেন। রাজা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং অনেক যত্নে বিবিধ বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করাইয়াছিলেন। মহাভারতে দ্রৌপদীর বিবরণ সুপ্রচারিত আছে। সীতার বৃত্তান্ত যেমন রামায়ণে প্রসিদ্ধ, দ্রৌপদীর জীবনচরিতও তদ্রূপ মহাভারতের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। রাজকন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে রাজা স্বয়ম্বর প্রথানুসারে তাঁহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া এক লক্ষ্য প্রস্তুত করাইলেন; অর্থাৎ মণিময় চক্ষুর্বিশিষ্ট এক স্বর্ণ মৎস্য নির্ম্মাণ করাইয়া শূন্যে অতি উচ্চ স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ নীচে এক রাধাচক্র রাখাইলেন। রাধাচক্রের ছিদ্র এমত সূক্ষ্ম যে একটী বাণমাত্র তন্মধ্য দিয়া যাইতে পারে। তৎপরে সর্ব্বত্র এই প্রচার করাইলেন যে, যে কেহ রাধাচক্র ভেদ পূর্ব্বক মৎস্যের চক্ষুঃ বিদ্ধ করিবেন, তাঁহাকেই রূপগুণ সুসম্পন্না কন্যা সমর্পণ করিবেন। চতুর্দ্দিকস্থ নৃপতিগণ দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ অভিলাষে পঞ্চালাধিপতির সভায় আসিতে লাগিলেন, এবং অন্যান্য ভদ্র বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরাও অনেকে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে পাণ্ডুপুত্রগণ দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণায় রাজ্যচ্যুত ও দেশত্যাগী হইয়া স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারাও উক্ত সংবাদ শ্রবণানন্তর দ্রুপদ

সভায় উপস্থিত হইলেন। অভ্যাগত রাজগণ রাধাচক্র ভেদ করিতে অক্ষম হইলে, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন কৃত-কার্য্য হইয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে স্বীয়-আবাসে প্রত্যাগমন করেন। পুরাকালে স্বয়ম্বরপ্রথা স্থলবিশেষে নাম মাত্র ছিল। অনেক সময়ে ধনুর্দ্ধর, যোদ্ধা, বলী, গুণবান, ধনাঢ্য প্রভৃতি যোগ্য পাত্রকেই কন্যা দান করা হইত। এক্ষণেও জনক জননীগণ সৎপাত্র অনুসন্ধান করতঃ দুহিতৃগণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এতদ্দেশে ইতিপূর্ব্বে স্বয়ম্বর প্রথা বাস্তবিক প্রচলিত ছিল। তখন ভদ্রকুলোদ্ভবা ভামিনীগণ অভ্যাগত ভদ্রসন্তানগণের সভা মধ্যে প্রবেশ করতঃ বাম হস্তে দধিভাণ্ড ও দক্ষিণ হস্তে পুষ্পমালা লইয়া মনোনীত পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিতেন।

আক্ষেপের বিষয় এই, দ্রৌপদী কেবল অর্জ্জুনের ভার্য্যা হইলেন না, কিন্তু যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুন, পঞ্চ ভ্রাতারই রমণী হইলেন। এই ঘৃণার্হ পদ্ধতি তৎকালে জগতের নানা স্থলে প্রচলিত ছিল। এক্ষণে তদ্বিপরীত প্রথা-কৌলীন্য-বঙ্গদেশের কালস্বরূপ হইয়াছে। কতদিনে এই কুরীতি এদেশ হইতে তি-রোহিত হইবে! পৃথিবীর কোন২ অঞ্চলে অদ্যাপি বহুস্বামীত্ব প্রচলিত আছে।

দ্রৌপদী লাভ করিবার কিয়দ্দিনানন্তর পাণ্ডবগণ

হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া, পরম সুখে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির এই সময়ে নানাদেশ জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার স্বাধীনত্ব ও সম্রাটত্ব স্থিরীকৃত হয়। দ্রৌপদীর আহ্লাদের ও সৌভাগ্যের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার গর্ভে পঞ্চ স্বামির ঔরসে পঞ্চ সন্তান জন্মে। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের ঈদৃশ সমৃদ্ধি সহ্য করিতে অপারক হইযা, তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার নানা উপায চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শকুনি নামক তাঁহার মাতুলের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবর্ত্তিত করাইয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব জিনিয়া লইলেন। ক্রমে যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতার স্বাধীনতা ও পরিশেষে দ্রৌপদীকেও হারিলেন। তদুপলক্ষে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর যেরূপ অবমাননা করেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। বোধ হয়, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শুভ সময়ে সভামধ্যে সমুপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর মান রক্ষা না করিলে, কুরু পাণ্ডবদিগের সহিত সেই দিনেই ঘোরতর সংগ্রাম হইত! পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনের অত্যাচারের, বিশেষতঃ সদ্গুণালঙ্কৃতা দ্রৌপদীর অপমানের সংবাদ শুনিয়া, প্রজাগণ বিদ্রোহী হইতে উদ্যত ছিল, এবং মহাবীর পঞ্চ পাণ্ডবের পক্ষীয় হইয়া তাহারা যে অচিরাৎ সমরানল প্রজ্বলিত করিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র নানা স্তুতি বাক্যে শোকাকুলা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং তাহাই কেবল নহে, পাণ্ডবদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করতঃ দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়া দিলেন। পাশ ক্রীড়ায় স্ত্রী হারা যে কেবল এই দেশেরই প্রাচীন প্রথা ছিল, তাহা নহে। ইউরোপ খণ্ডের মহাপুরুষেরা অনেকবার দ্যূত ক্রীড়ায় গুপ্তভাবে স্ত্রী পর্য্যন্ত পণ করিতেন। এইন্‌সওযার্থ সাহেব রচিত প্রসিদ্ধ উপাখ্যানে এমত এক জনের বিবরণ লিখিত আছে। বোধ হয়, খ্রীষ্টাব্দের ষড়্‌দশ শতাব্দীতে উক্ত রীতি প্রচলিত ছিল। দুর্য্যোধন পিতৃব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করাইয়া তদীয় রাজ্য জিনিলেন, এবং পাণ্ডবদিগকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে বাধ্য করিলেন। এবার বৃদ্ধা মাতা কুন্তী তাঁহাদিগের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। কিন্তু দ্রৌপদী পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মতা না হওয়াতে পাণ্ডবেরা সস্ত্রীক অরণ্যানী গমন করেন। দ্রৌপদী অসহ্য বনবাস যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও পতিসেবা ও অতিথি সৎকার করিতে ক্রটি করেন নাই। পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইয়াও যে দুর্য্যোধন ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। দ্রৌপদীর সতীত্ব নষ্ট করণাভিপ্রায়ে নিজ ভগ্নীপতি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বনে পাঠান। জয়দ্রথ ছদ্মবেশে বনমধ্যে

প্রবেশ করতঃ পাণ্ডবাশ্রমের সমীপস্থিত কোন স্থলে অবস্থিতি করিয়া দ্রৌপদীকে হরণের সুযোগ প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। এক দিবস যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের অনুপস্থিতিকালে জয়দ্রথ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক আপন রথে উত্তোলন পুরঃসর অতিবেগে রথ চালাইলেন। দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি ভীম ও অর্জ্জুন মৃগয়া করিতে করিতে শুনিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, এক খানরথ দ্রুতবেগে গমন করিতেছে এবং তাহার মধ্য হইতে ক্রন্দনধ্বনি আসিতেছে। তাহাতে শীঘ্র রথ আক্রমণ করতঃ জয়দ্রথকে পরাস্ত করিয়া মুষ্টি ও পদাঘাতে প্রায় তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, এমত সময়ে যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃগণকে নিরস্ত করতঃ ভগ্নীপতিকে তিরষ্কার করিয়া বিদায় করিলেন। তৎপরে বিরাটভবনে অজ্ঞাতবাসকালে কীচক কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর অবমাননা হয়, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোনই কলঙ্ক জন্মে নাই। তিনি যেখানে থাকিতেন, সেই খানেই প্রশংসাভাজন হইতেন। সুতরাং বিরাটরাজমহিষী যে তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অজ্ঞাতবাসকাল অতীত হইলেই কুরুক্ষেত্রের ঘোরতর সংগ্রামের আয়োজন হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা রণজয়ী হইলেন এবং হস্তিনাপুরে

পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির সস্ত্রীক সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ ও অন্য চারি পাণ্ডব তৈল, গঙ্গোদক প্রভৃতি তাঁহাদের উভয়ের মস্তকে ঢালিয়া দেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষেও দ্রৌপদী সর্ব্বসমক্ষে যুধিষ্ঠিরের সহিত একাসনে উপবিষ্টা হয়েন। অধিকন্তু, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি রাজমহিষীরাও অভ্যাগত মুনি ও রাজগণের মধ্যে উপস্থিতা ছিলেন। বিপ্রকন্যাগণও অনেকে তথায় আসিয়াছিলেন। ইহাতে অবশ্যই প্রতীত হইতেছে, যে তৎকালের ভামিনীগণ অধুনাতন পিঞ্জরবদ্ধা মহিলাদের ন্যায় ছিলেন না। তাঁহারা মহা মহা সভাতেও উপস্থিতা হইতেন। হায়, কত দিনে আবার দেশীয় পূর্ব্ব সুরীতি প্রচলিত হইবে! দ্রৌপদী-চরিত্রের আর এক চমৎকার উদাহরণ এস্থলে উল্লেখ করা উচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সাঙ্গ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের কুপরামর্শে অশ্বত্থামা রজনীযোগে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া, দ্রৌপদী-ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের ও পাণ্ডব ভ্রমে পাণ্ডব পুত্রগণের মস্তক ছেদন পুরঃসর দুর্য্যোধনের নিকট আনয়ন করেন। তাহাতে ভীম অশ্বত্থামাকে পরাস্ত করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে, দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "বীরবর, গুরুপুত্র বধ করিও না। যদিও অশ্বত্থামা অবিচারে আমার ভ্রাতা ও পঞ্চ পুত্রকে বধ করিয়া-

ছেন, তথাপি গুরুপুত্র অবধ্য; ইঁহাকে আমায় ভিক্ষা দাও।” লেখা আছে, ভীম নিরস্ত হইয়া দ্রৌপদীর অনুরোধে অশ্বত্থামাকে মুক্ত করেন। এমত আশ্চর্য্য-দয়া-র্দ্রতা, শান্তপ্রকৃতি যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যাতেই সম্ভবে। বোধ হয়, দ্রৌপদীর ন্যায় দয়াশীলা রমণী জগতীতলে অতি অল্পই পাওয়া যায়। বহুকাল পরম সুখে রাজত্ব করণানন্তর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চস্বামীর সহিত অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনার ও যুজুৎসু নামক ধৃতরাষ্ট্রের অবশিষ্ট পুত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ হিমালয় সমীপে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করেন।

১১। গান্ধারী।

মহাভারতে উল্লিখিত সুবিখ্যাত রমণীদিগের মধ্যে গান্ধারী আর এক জন। গান্ধার অথবা খান্দার দেশে তাঁহার জন্ম হয়। ক্ষত্রিয় ও গান্ধারীয় লোকেরা পুরাকালে অভেদ্য ছিল। হিরদতস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাকর্ত্তৃক উল্লিখিত ভারতবর্ষস্থ যে জাতীয় লোকেরা পারস্যাধিপতি দেরায়স্ হিষ্টাস্পস্‌কে রাজকর প্রদান করিতেন এবং জরাক্‌সিসের সহিত গ্রিস্‌দেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন, বোধ হয়, গান্ধার বাসীগণই সেই জাতি। ক্ষত্রিয়েরা সিন্ধুনদীর এক পার্শ্বে ও গান্ধারীয়েরা তাহার অপর পার্শ্বে বাস করিতেন।

এতদ্ব্যতীত, উক্ত দুই জাতির মধ্যে আর কোন প্রভেদ ছিল না। পাণ্ডুরাজ অরণ্যবাসী হইলে ধৃতরাষ্ট্র স্বজাতীয় কোন সম্ভ্রান্ত কুমারীর পাণি গ্রহণ অভিলাষে গান্ধার দেশে দূত প্রেরণ করেন। তাহাতে গান্ধারাধিপতি স্বীয় কন্যা গান্ধারীকে শকুনির সঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন। এক্ষণে উক্ত দুই জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। অনেক কালাবধি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, ভাষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন হওয়াতে উক্ত জাতিদ্বয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে; ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়।

গান্ধারী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। যদিও অন্ধ রাজের সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল, তথাপি তিনি ভর্ত্তার প্রতি কখনই অসমাদর প্রদর্শন করেন নাই, বরং সর্ব্বদা তাঁহাকে তুষ্ট করিতেন, সকলে সচ্চরিত্রা রাণীর যথেষ্ট সমাদর করিত।

ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর দুর্য্যোধন প্রভৃতি কয়েক পুত্র ও দুঃশীলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সতী, ধর্ম্মিষ্ঠা রাজ্ঞীর এতদূর পর্য্যন্ত সম্মান ছিল যে ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের সহিত পাণ্ডবদিগের বিবাদ ভঞ্জনার্থ গান্ধারীকে রাজ সভায় আহ্বান করেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই সৎপরামর্শ শ্রবণ করিতেন না, সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। কৌরবদিগের মৃত্যু সমাচার শ্রবণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র ও

গান্ধারী যার পর নাই শোকাকুল হয়েন। তাহাতে পরদুঃখে কাতর পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে তাঁহাদিগের সান্ত্বনা করণার্থ পাঠাইয়া দেন। কৃষ্ণ যথাসাধ্য অন্ধ রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া গান্ধারীর গৃহে গমনোদ্যত হইতেছিলেন, এমত সময়ে শোকাকুল রাজ্ঞী স্বয়ং রোদন করিতে২ উপস্থিতা হইলেন, এবং কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র অচেতন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ রোদন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। গান্ধারীর চৈতন্যোদয় হইলে দ্বারকাধিপতি নানা স্নেহবচনে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করতঃ পাণ্ডবদিগের নিকট প্রত্যাগমন করেন। গান্ধারী যে কেবল নিজ দুঃখেই কাতরা ছিলেন, তাহা নহে, পুত্রশোকে আকুল বৃদ্ধ অন্ধ রাজার দুর্দ্দশা দেখিয়াও তাঁহার ততোধিক যন্ত্রণা হইত। তিনি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি প্রকাশ করতঃ নিজ শোক সম্বরণ ও অন্ধ রাজার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য সকলের সহিত গান্ধারী গঙ্গাতীরস্থ অরণ্য মধ্যে কিয়ৎকাল যাপন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। গান্ধারীর জীবনচরিতে এমত কোন অসাধারণ ঘটনা দৃষ্ট হয় না, যাহাতে করিয়া পাঠকগণ বিস্মিত হইতে পারেন। গান্ধারী সুস্থিরা, সুশীলা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। বোধ হয়, এজন্যই তাঁহার এত খ্যাতি। রাজকুলে এরূপ গৃহধর্ম্মিণী সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কোন না কোন

বিশেষ দোষ বা গুণ জন্য রাজ্ঞীগণ খ্যাতাপন্না হয়েন; —যথা, মেসেলীনা, কুন্তী, এলিজাবেথ ও ইসেবেলা।

১২। বিদ্যোত্তমা।

কবিবর কালিদাসপত্নী বিদ্যোত্তমা যথার্থই বীরাঙ্গনা ছিলেন। বিদ্যোত্তমার বিবরণ কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি, যে তিনি সদানন্দন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজার কন্যা, এবং অত্যন্ত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। জ্ঞান গর্ব্বে পূর্ণা বিদ্যোত্তমা, পরিণয় সম্বন্ধে এক অদ্ভুত পণ করেন, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিচারে পরাভূতা না করিলে কেহ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে দ্রৌপদী, সীতা প্রভৃতির পরে হিন্দু সমাজের অধিকতর সভ্যতা হয়; নতুবা দৈহিক পরাক্রম, সৌন্দর্য্য, সম্পত্তি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, বিদ্যোত্তমা কৃতবিদ্য জনের আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? বিক্রমাদিত্যের সময়ের স্বয়ম্বর প্রথা উৎকৃষ্টতর ছিল, নতুবা দ্রৌপদীর ন্যায় বিদ্যোত্তমাও অবশ্য কোন বীর পুরুষের অনুসন্ধান করিতেন। বিদ্যোত্তমার উক্ত অসাধারণ পণের বিবরণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, সুপণ্ডিত মহা মহোপাধ্যায়গণ নানা স্থল হইতে কন্যারত্ন লালসায় সদানন্দনের সভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বিদ্যোত্ত

মাকে বিচারে পরাজয় করিতে পারিলেন না। সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া নিজ২ স্থানে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। বারম্বার এরূপ হওয়াতে, সলজ্জ ও বিফলাশ পণ্ডিতবর্গ ষড়যন্ত্র করিয়া কৌশলক্রমে কোন অর্ব্বাচীনের হস্তে বিদ্যোত্তমাকে সমর্পিত করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভাবিলেন যে জ্ঞানগর্ব্বিতা রাজবালার পক্ষে ইহা অপেক্ষা হীনতা আর হইতেই পারে না, ফলতঃ এ অবস্থায় রাজকন্যার অবমাননাতেই তাঁহাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। পণ্ডিতবর্গ অত্যন্ত উদ্বেগ সহকারে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখেন, কালিদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ একটী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে শাখায় নির্ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাই ছেদন করিতেছেন। বুধগণ তদ্দৃষ্টে ভাবিলেন, কালিদাসের ন্যায় হস্তীমূর্খ কুত্রাপি জন্মে নাই, অতএব ইহাকে রাজসভায় ছলক্রমে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। তাহাতে কালিদাসকে ইঙ্গিত করায়,তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলে, বুধগণ বলিলেন,“বাপু! তোমার কপাল ফিরেছে, রাজকন্যা তোমায় বিবাহ করিতে চান, কেবল রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলেই হয়।” কালিদাস সম্মত হইলে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে এক মৌনী সাজাইয়া বৃদ্ধপক্ষীয়েরা অগ্রে

রাজসভায় গমন করিলেন, এবং নব্য সম্প্রদায়িকেরা কালিদাসকে মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া চলিলেন। রাজসভায় সমুপস্থিত হইলে প্রাচীনবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক কালিদাসকে প্রধান আসনে বসাইলেন। পরে রাজকন্যা, পণ্ডিতবরের আগমন সংবাদ পাইয়া, সভায় উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতেরা কহিলেন, "রাজবালে! ইনি আমাদের প্রধান আচার্য্য, আমাদিগকে আপনি বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন, যদি ইঁহাকেও পরাজয় করিতে পারেন, জানিব, আপনার সদৃশা বিদ্যাবতী জগতীতলে আর নাই। কিন্তু সম্প্রতি ইনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব ইঙ্গিত দ্বারা প্রশ্ন করুন।" তাহাতে সরলা রাজবালা পণ্ডিতদিগের বাক্‌পটুতায় প্রতারিতা হইয়া, একটী অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন। রাজকন্যা আমার এক চক্ষু উৎপাটন করিতে চান, আমি তাঁর দুই চক্ষু উৎপাটন করিব, ইহা ভাবিয়া কালিদাস দুইটী অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রাজবালে! আপনি পরাস্তা হইলেন। একটী অঙ্গুলী উত্তোলন দ্বারা পৃথিবীর এক মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করাতে আপনি সৃষ্টি কার্য্যের অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের আচার্য্যবর দুইটী অঙ্গুলী উত্তোলন দ্বারা উক্ত গুরুতর ব্যাপারের যথার্থ বিবরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অর্থাৎ প্রকৃতি

ও পুরুষ উভয়ের যোগে জগতের সৃষ্টি। এক্ষণে আমাদিগের প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে পাণি দান করিতে প্রস্তুতা হউন।” বিদ্যোত্তমা, পণ্ডিতদিগের কৌশলে নিরুত্তরা হইয়া, অর্ব্বাচীন কালিদাসকে বিবাহ করিতে সম্মতা হইলেন।

উপরোক্ত বিবরণ কতদূর সত্য, এক্ষণে স্থির করা দুঃসাধ্য। বোধ হয়, সুচতুরা বিদ্যোত্তমা এরূপ কৌশলে পরাস্তা হন নাই। কালিদাসের আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তিই তাঁহার পরাভবের মূল কারণ। সে যাহা হউক, যোগ্য পাত্রেই বিদ্যোত্তমার কোমল কর প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং কালিদাসও, বোধ হয়, রূপগুণ-সুসম্পন্না ভার্য্যারত্ন লাভে পুলকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় ভামিনীগণের বর্ত্তমান অবস্থা কি জঘন্য। তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, কেমন নীচ বোধ হয়! এক্ষণে বিদ্যোত্তমার ন্যায় বিদুষী স্ত্রীলোক কয় জন পাওয়া যায়? স্বয়ম্বর প্রথাই বা কেন প্রচলিত নাই? আর আধুনিক দারুণ উদ্বাহ পদ্ধতিই বা কে আনিল? হায়! কত দিনে এই সকল কুরীতি আমাদিগের জন্মভূমি হইতে তিরোহিত হইবে!

১৩। লীলাবতী।

লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। বেণ্টলী সাহে-

বের মতে ভাস্করাচার্য্য ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছি-
লেন। পাঠকবর্গের স্মরণ হইবেক, যে মহম্মদ গোর
ঠিক ঐ সময়ে দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধ
করেন। উক্ত কালনিরূপণ যথার্থ কি না, বলা যায় না।
বোধ হয়, ভাস্করাচার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর পুরা-
কালে জীবিত ছিলেন ; তাদৃশ সঙ্কট সময়ে যে আচা-
র্য্য মহাশয় নির্ব্বিঘ্নে গণনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা
কখনই সম্ভবে না। এমত কিম্বদন্তী, যে ফায়জ নামক
আক্‌বর সায়ের জনৈক সভাসদ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়
দিয়া সংস্কৃত ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা করতঃ কএক-
খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। ফা-
য়জের মতে ভাস্করাচার্য্য বদর সহর নিবাসী ছিলেন।
সে যাহা হউক, আচার্য্যের লীলাবতী বই আর সন্তান
সন্ততি ছিল না। সুতরাং তিনি লীলাবতীকে অত্যন্ত
ভাল বাসিতেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে কন্যার ভাবি ম-
ঙ্গলামঙ্গল গণনা করিয়া, আচার্য্য জানিতে পারিয়াছি-
লেন, যে লীলাবতী পতিপুত্র বিহীনা হইবেন। তাহাতে
অতিশয় দুঃখিত হইয়া অনেক গণনার পর স্থির করি-
লেন যে নক্ষত্র দোষ খণ্ডাইবার একটী মাত্র উপায়
আছে ; সেই উপায় হইলেই মঙ্গল, নতুবা বিলক্ষণ
বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অনন্তর লীলাবতীর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে,
অনেকানেক বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া

আনাইলেন এবং শুভলগ্ন "নির্ণয়ার্থ জলপূর্ণ এক পাত্রের উপর অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত একটী তাম্রি রাখিলেন। বলিলেন, ঐ ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া তাঁবি জলমগ্ন হইবার কালে, কন্যা সম্প্রদান করিলে, কন্যা বিধবা হইবে না। এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অবধারিত লগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ লীলাবতী খেলিতেং লগ্ন নির্দ্ধারণযন্ত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার সিঁথি হইতে একটী ক্ষুদ্র মুক্তা জলবিন্দুবৎ সেই তাঁবিতে পতিত হইয়া, জল প্রবেশপথ রুদ্ধ করিল। তাঁবি জলমগ্ন হওনের আনুমানিক কাল অতীত হইলে, আচার্য্য আসিয়া দেখেন, প্রমাদ উপস্থিত। ক্ষুদ্র একটী মুক্তার পতনে জল-প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ ও শুভলগ্ন অতীত হইয়াছে। তাহাতে অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং লীলাবতী নাম চিরস্মরণীয় করণার্থ তাঁহার নামে এক খানি অঙ্ক পুস্তক রচনা করিলেন। পুস্তক খানি প্রশ্নোত্তর ভাবে লিখিত। প্রদর্শিত অঙ্ক প্রণালী অতীব চমৎকার। প্রথম পরিভাষা নিরূপণ, ক্রমে সঙ্কলন, ব্যবকলন, পূরণ, বর্গ, বর্গ মুল প্রভৃতি অঙ্ক করণের অতি সুগম ও উত্তমং সূত্র ও উদাহরণ লিখিত আছে।"

লীলাবতী যে কেবল উক্ত গ্রন্থ নিবন্ধনই খ্যাতা-

পন্না তাহা নহে। তিনি বৃক্ষমূলে বসিয়া স্বল্প কালের মধ্যে বৃক্ষের শাখা ও পল্লবের সংখ্যা বলিতে পারিতেন। কোল্‌ব্রুক ও টেলর সাহেব লীলাবতী গ্রন্থের অনুবাদ এবং সুবিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ হটন সাহেব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। অধুনা আমরা আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মহিলাদিগের অঙ্ক নৈপুণ্যের বিবরণ পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু লীলাবতীর বিবরণ স্মরণ করিলে, সেই সকল বৃত্তান্ত সামান্য বোধ হয়। স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বোধ হয়, অচিরে অনেক লীলাবতী ভারতে জন্মিবেন।

১৪। খনা।

খনা নামধারিণী দুইটী রমণী ছিলেন। একের স্বামীর নাম বল্লালপুত্র লক্ষ্মণ সেন। ইনি বিদ্যাবতী ও রূপবতী ছিলেন বটে, কিন্তু যে খনা দেশে খ্যাতাপন্না, ইনি তাঁহার অপেক্ষা অনেক অংশে সামান্যা। অপরের জন্ম বিবরণ প্রায় অজানিত। বোধ হয়, কোন উৎকৃষ্ট জ্যোতিষীর গৃহে ইনি পালিতা হইয়া থাকিবেন, এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ ইঁহার এত জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এমত কিম্বদন্তী, যে বরাহ নামক বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতের এক সন্তান জন্মে এবং তিনি সেই সন্তানকে স্বল্পায়ু গণনা করিয়া বন-

বাস অথবা আসাইয়া দেন। বোধ হয়, মূসার ন্যায় আশ্চর্য্য রূপে ইঁহার জীবন রক্ষা পাইয়া থাকিবেক। সে যাহা হউক, ইনি অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বিধাতার অননুভূত নির্ব্বন্ধানুসারে উক্ত খনার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁরা উভয়ে বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হওয়াতে, রাজা মিহিরকে সভাপণ্ডিত করেন; তাহাতে শীঘ্রই মিহিরের সহিত বরাহের পরিচয় হয়। বরাহ যদিও তাঁহাকে আপনাপেক্ষা অধিক পণ্ডিত জানিয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ ঈর্ষ্যা করিতেন, তথাপি যখন জানিতে পারিলেন যে মিহির তাঁহার নিজ ঔরসজাত সন্তান এবং খনা তাঁহার পুত্রবধূ, তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। স্নেহসহকারে তাঁহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং সেই অবধি তাঁহারা সেই স্থলেই বাস করিয়াছিলেন। রাজাও উক্ত বিবরণ শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনল বসনে ঢাকা যায় না, বিদ্যাও গুপ্ত থাকে না। অতএব গৃহাভ্যন্তরেও যে খনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইবেক, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? খনার এমনি বিস্ময়জনক ব্যৎপত্তি জন্মিয়াছিল, যে কঠিনং গণনা সকল তিনি অনায়াসে করিতে পারিতেন। বরাহ ও মিহির যাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না, খনা সেই সুকঠিন গণনাও করিয়া দি-

তেন। কোন সময়ে বিক্রমাদিত্য নক্ষত্র সংখ্যা জানিতে ইচ্ছা করাতে, বরাহ অপারক হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে বসিয়া আছেন, এমত কালে রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া খনা বরাহকে ভোজন করিতে বলিলে, তিনি নিজ বিপদের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। খনা তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকাতে কয়েকটী অঙ্ক পাতিয়া শ্বশুরকে বলিলেন, আকাশে এত নক্ষত্র আছে। তখন বরাহ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ভোজনপান সাঙ্গ করিয়া, রাজসমীপে নক্ষত্র সংখ্যা জ্ঞাত করিলেন। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরাহ, এই চমৎকার সূত্র কোথায় পাইলে?" বরাহ পুত্রবধূর আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া খনাকে সর্ব্বপ্রধান সভাপণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে,তাঁহাকে সভায় আনিতে আদেশ করেন। বরাহ রাজঅভিসন্ধি না বুঝিয়া, অপমান ভয়ে মিহিরকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া, খনার প্রাণনাশ করিতে আদেশ করেন। মিহির পিতৃ আজ্ঞা অলঘ্য জানিয়া রোদন করিতেং খনার জিহ্বা ছেদন করেন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণ নষ্ট হয়।

খনার বিবরণ পাঠে, কে না স্বীকার করিবেন, যে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইলে মনুষ্যের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হয়। জাতিভেদ ও স্ত্রীলোকদের অংন্তপুরবাস পদ্ধতি দেশে বদ্ধমূল না থাকিলে, কি বরাহের ন্যায় পণ্ডি-

তের ঈদৃশ কুমতি হইত? না মিহিরের ন্যায় স্বামীর স্ত্রীহত্যা দোষ ঘটিত? এক্ষণেও স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কার বশতঃ প্রায় লেখাপড়া শিখিতে চাহেন না। এই ভয়াবহ কুসংস্কারস্রোতঃ যে কত দিনে নিবারিত হইবে. তাহা কে বলিতে পারে?

খনার বচন সুপ্রসিদ্ধ ও দেশীয় পঞ্জিকার মূল নিম্নে তাহার দুই একটী উদ্ধৃত হইল।

গ্রহণ গণনা।

"যেই মাসে যেই রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশি, যদি পায় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহু চাঁদে গ্রাসি।"

অস্যার্থঃ।

"মেষে বৈশাখ, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, ইত্যাদি ক্রমেতে মাসের রাশির সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকিলে যদি ঐ দিবসে পূর্ণিমা হয়, চন্দ্রগ্রহণ হইবে।"

মৃত্যু গণনা।

"আসিয়া দূত দাঁড়ায় কোণে, কথা কহে উর্দ্ধ নয়নে, শিরে পৃষ্ঠে বুকে হাত, সেই দূতে করে বাত, কুটো ছিঁড়ে করে খাই, খনা বলে ফুরাল আই।"

অস্যার্থঃ।

"দূত কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্বাদ আনিয়া যদি বাটীর বা ঘরের কোণে দণ্ডায়মান হয়, বা উর্দ্ধ নয়নে কথা কহে, কিম্বা মস্তকে বা পৃষ্ঠে বা বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া

থাকে, কিম্বা কুটি হস্তে ছিঁড়ে বা দন্তে চর্ব্বণ করে, রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।”

১৫। সঞ্জগতা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল প্রধান অঙ্গনাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, তাঁহাদের অনেকেরই উপাখ্যান উপন্যাসরূপ তমসাবৃত। তাঁহারা যে যে মহৎ কার্য্যের জন্য সুবিখ্যাত, সেই সকল কতদূর পর্য্যন্ত সত্য, এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা তাঁহাদের বিষয় যাহা কিছু লিখিয়াছি, সেই সকলই মিথ্যা, ইহা বলা যেমন অযৌক্তিক, সেই সকলই সত্য, ইহা বলাও সেই রূপ। তবে কি না, পণ্ডিতগণের সাহায্যে আমরা যতদূর পারিয়াছি,যুক্তিসঙ্গত বৃত্তান্তই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে যে ভূমিতে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত দৃঢতর, এবং ইতিহাসরূপ রবি কিরণে সমুজ্বল। সঞ্জগতা প্রভৃতি কামিনীগণের বিবরণ আধুনিক, সুতরাং অধিকতর যথার্থ ও ঐতিহাসিক প্রমাণাধীন। সঞ্জগতার বিবরণ যদিও সুপ্রসিদ্ধ কবিবর চাঁদের রচনার মূল, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যে সীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলাগণের বিবরণ যেমন বিকৃত, সঞ্জগতার বিবরণে তদ্রূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না। ইহা যে পরিমাণে অলৌকিকতাবিরহিত,

সেই পরিমাণেই প্রকৃত। সঞ্জগতা কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাঁদের কন্যা। জয়চাদ ও পৃথ্বীরাজ, উভয়েই রাজপুত্র বংশোদ্ভব ছিলেন। জয়চাঁদ রাঠোর কুল-তিলক, ও পৃথীরাজ চোহান বংশাবতংস বলিয়া বিখ্যাত। উক্ত বংশদ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বৈরভাব ছিল। পৃথীরাজের যখন সম্পূর্ণ প্রতিপত্তি, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। জয়চাঁদ তাহাতে আপনাকে অবমানিত বিবেচনা করিয়া, রাজসূয় যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন। কি অশ্বমেধ, কি রাজসূয়, উভয় যজ্ঞেই সকল রাজাকে উপস্থিত করাইতে হয়। সুতরাং যজ্ঞকর্ত্তার আধিপত্যের সীমা থাকে না। তখন অভ্যাগত সকলে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। এই জন্যই বোধ হয়, পৃথ্বীরাজের যজ্ঞসময়ে জয়চাঁদ উপস্থিত হয়েন নাই, এবং জয়চাঁদের যজ্ঞকালে পৃথ্বীরাজ আমন্ত্রণ গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু অতি অভাবনীয় এক ঘটনার দ্বারা জয়চাঁদের অবমাননা হয়। রাজাদেশে রূপবতী সঞ্জগতা যজ্ঞ সাঙ্গের পর মাল্য, চন্দন ও দধিভাণ্ড হস্তে করিয়া মনোগত বরান্বেষণে রাজসভায় উপস্থিতা হয়েন, এবং অভ্যাগত নৃপতিবর্গকে উপেক্ষা করিয়া পৃথ্বীরাজের যে স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি দ্বারদেশে দৌবারিকের কার্য্য করণার্থ সংস্থাপিত হইয়াছিল, অনুরাগাতিশয্য প্রযুক্ত সেই প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করেন। রাজা জয়চাঁদ স্বপ্নেও যাহা চিন্তা

করেন নাই, তাহাই নিজ সভায় স্বীয় কন্যা কর্ত্তৃক ঘটিল দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীরাজ এই শুভ সংবাদ শ্রবণান্তর সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া অসাধারণ বল প্রকাশ করিয়া সঞ্জুগতাকে আপন রাজধানীতে লইয়া যান। তৎপরে মহা আড়ম্বর সহকারে তাঁহাদিগের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।

কথিত আছে যে বিবাহের দিবসাবধি পৃথ্বীরাজ সঞ্জুগতার প্রতি এমনি আসক্ত হইয়াছিলেন, যে অনেক কালাবধি রাজকার্য্য বিসর্জন দিয়া, কেবল তাঁহারই সহিত বিলাস করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে কামিনীরত্ন ঈদৃশ বীরবরের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার শত্রুর আগমন (অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরের অভিসন্ধি) জ্ঞাত হইয়া, ভোগসুখমগ্ন নৃপতিকে রণে প্রবৃত্ত হইতে উত্তেজিত করেন। এমন কি, তদীয় রাজমহিষীর প্রযত্নেই পৃথ্বীরাজ ঘোরতর সংগ্রামের উপযুক্ত আয়োজন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সঞ্জুগতা হরণ কালে, পৃথ্বীরাজ যে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়েন, তাহাতে তাঁহার অর্দ্ধাংশস্থ অনেক বীর হত হইয়াছিলেন ; সুতরাং আপাততঃ উপযুক্ত রণদক্ষ সেনানীগণের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ঘটে। এই জন্যই বোধ হয়, স্বীয় ভগিনীপতি মেওয়ারের রাজাকেও দিল্লীতে আনাইয়াছিলেন। সমরকাল উপস্থিত হইলে সঞ্জুগতা স্বহস্তে রাজাকে রণসজ্জা পরাইয়া দেন। রণস্থলে যাইবার

পূর্ব্বে, মাতা, ভগিনী, বনিতা, দুহিতা প্রভৃতি গৃহাঙ্গনাদিগের নিকট বিদায় লওয়া, তৎকালের রীতি ছিল। তাঁহারা যোদ্ধৃগণকে স্পার্টার রমণীবৎ, হয় সমরশায়ী নয় সমরজয়ী হইতে অনুরোধ করিতেন; কোন ক্রমেই প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিতেন না। সঞ্জগতা বিদায়কালে, যথোচিত বীরত্বপ্রকাশ করিতে ভর্ত্তাকে অনুরোধ করিলেন বটে, তথাপি সেই মহাশঙ্কটকালে, রাজার প্রতি স্নেহদৃষ্টি পূর্ব্বক রোদন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। রাজ প্রাসাদের বহির্ভাগে রণবাদ্য বাজিতেছিল, কিন্তু তাহা যেন পৃথ্বীরাজের নিধন সম্বাদবহ হইয়া তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এবং রাজা "রণজিত" দ্বার হইতে সমরক্ষেত্রাভিমুখে গমন করণাবধি তিনি বলিতে লাগিলেন, "জন্মের মত তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল; স্বর্গে পুনশ্চ দর্শন সুখ ভোগ করিব।" উপস্থিত যুদ্ধে যে পৃথ্বীরাজ পরাভূত ও হত হইয়াছিলেন, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতিহাস লেখকগণ সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সঞ্জগতা পতি বিহনে অধীরা হইয়া পতি চিতায় সহমৃতা হয়েন। সুতরাং তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, "জীবনে কি মরণে আমি তোমার সঙ্গিনী হইব," সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হইল। পৃথ্বীরাজের রণস্থলে গমনাবধি সুঞ্জগতা নিরবচ্ছিন্ন জল পান করিয়া জীবন

ধারণ করিয়াছিলেন। পুরাতন দিল্লীবিভাগে পর্য্যটকগণ অদ্যাপি সঞ্জগতার বিলাস ভবনের ভগ্নাংশ, প্রাচীর প্রভৃতি দেখিতে পান। বোধ হয়, যে সকল সহমৃতার যথার্থ বৃত্তান্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সঞ্জগতা তন্মধ্যে প্রথম। ভারতবর্ষের বীরধাত্রী নামটী যে যথার্থ হইয়াছে, ইহা উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া কে অস্বীকার করিতে পারে?

১৬। পদ্মিনী।

রাজপুত্র-ঐতিহাসিক বিবরণ মধ্যে অনেক হিন্দু বীরাঙ্গনার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে পদ্মিনীর উপাখ্যান অতি মনোহর। তাঁহার সৌন্দর্য্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ও শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ পাঠে পাষাণহৃদয়েরও নেত্রনীর নিপতিত হয়। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে লঙ্কাধিপতি হামীরশঙ্কের ঔরসে পরম রূপবতী পদ্মিনীর জন্ম হয়। রাজা দুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার নাম পদ্মিনী রাখিলেন। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য রশ্মি যেমন উজ্জ্বল, শরৎ-সুধাংশু-অংশু পূর্ণিমার রজনীতে যেমন স্বচ্ছ, যৌবনকালে পদ্মিনীও সেই রূপ অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্টা হইতে লাগিলেন। সরোবরে নলিনী বিকশিত হইলে এবং মন্দ মন্দ গন্ধবহ সেই গন্ধ বহন করিয়া চারিদিক আমোদিত করিলে, প্রমত্ত ভ্রমরগণ যেমন মধু

পান আশয়ে মধুরস্বরে গান করিতে করিতে নলিনীর নিকট গমন করে, সেই রূপ পদ্মিনীর যশঃ সৌরভে মোহিত হইয়া নানা দেশ হইতে ভূপতিগণ তাঁহার পাণি গ্রহণাভিলাষে লঙ্কায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু নলিনী যেমন মধুকরগণের মধুরস্বরে মোহিত না হইয়া দিবাকর করে কর সমর্পণ করে, পদ্মিনীও তদ্রূপ অন্য নৃপতিগণের তোষামোদে পরাভূতা না হইয়া সূর্য্য সম বীর্য্যশালী চিতোরাধিপতি ভীমসেনের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। বিবাহের পর পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরা এবং তাঁহার ভ্রাতা বাদল তাঁহার সমভিব্যাহারে চিতোরে গমন করেন। পদ্মিনী সিংহলে যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে। ১২৭৫খ্রীষ্টাব্দে পদ্মিনী অপহরণ মানসে পাঠান সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ চিতোর আক্রমণ করেন। পরে জয়লাভে নিরাশ হইলে, কেবল দর্পণে পদ্মিনীর মুখপদ্ম দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইবার অঙ্গীকার করেন। চিতোরাধিপতিও প্রবল শত্রু হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার আশয়ে অগত্যা তাহাতে সম্মতি দেন। ধূর্ত্ত আলাউদ্দিন্ আপনার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া, প্রত্যাগমনকালে শিষ্টাচারে সরলহৃদয় ভীমসেনকে বশীভূত করিয়া, কৌশলক্রমে আপনার শিবিরে আনয়ন করেন, এবং পরে প্রচার করিয়া দেন, যে পদ্মিনীকে প্রাপ্ত না হইলে রাজাকে মুক্তি দিবেন না। পতিপ্রাণা পদ্মিনী স্বামির

এরূপ দুর্গতি শ্রবণে শোকে মূর্চ্ছাগতা ও ভূতলে পতিতা হইলেন। সখীগণ মহিষীর এরূপ অবস্থা দর্শনে ব্যস্তা হইয়া কেহ বা বদনে বারি সেচন, কেহ বা তালবৃন্ত ব্যজন, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে জ্ঞানোদয় হইলে মহিষী শোক সম্বরণ করিয়া এই ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধারের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে সম্রাটকে বলিয়া, পাঠাইলেন যে রজনীযোগে তিনি তাঁহার শিবিরে গমন করিবেন। আলাউদ্দীন্ পদ্মিনী-সহবাস-আশে উৎসুক হইয়া অস্ত্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করতঃ বিচিত্র বসন পরিধান ও অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে ছেন, এমন সময়ে পদ্মিনীসহ সাত শত শিবিকা মধ্যে সাত শত স্ত্রীবেশধারী সেনা তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইল। ভীমসেনও সেই অবসরে পদ্মিনী সমভিব্যাহারে নিজ গৃহে পলায়ন করিলেন। আলাউদ্দীন্ এই রূপে পদ্মিনালাভ আশায় হতাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু পদ্মিনার মুখপদ্ম বিস্মৃত হইতে অক্ষম হইয়া ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে, পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এইবার চিতোররাজ ভীমসেন তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। তাহাতে পদ্মিনী নিরুপায় হইয়া সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রদীপ্ত অনলে পতিতা হন,এবং নৃশংস আলাউদ্দীনও স্বীয়

দুরাশা পূর্ণ করণে অক্ষম হইয়া ক্ষুব্ধ মনে স্বদেশে ফিরিয়া যান।

পদ্মিনী-উপাখ্যান পাঠে দুইটী ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। "দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব রক্ষার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেও প্রস্তুত," ইহা চিন্তা করিয়া কে না তাঁহাদের প্রশংসা করিবে? দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়াতে দেশের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

১৭। তারাবাই।

তারাবাই বেড্‌নোরাধিপতি সুরতানের কন্যা। সুরতান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলা নামক জনৈক প্রবলপ্রতাপ মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্য ভারতবর্ষস্থিত তাকিৎপুর ও থোডা প্রদেশে বসতি করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু আফগানেরা তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া, থোডা হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করে। তাহাতে তিনি পুনরায় নিম্ন বেড্‌নোরে যাইয়া বাস করেন। পিতার ঈদৃশ দুর্দ্দশা দৃষ্টে, তারাবাই নারীকুলদুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলেন, অর্থাৎ ঘোটকারোহণ ও বাণ সন্ধান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন কি, সুরতান যখন থোডা পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে সসৈন্যে আফগানদিগের

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তারাবাইও অশ্বারোহণ করতঃ তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়াছিলেন।

রাণা রায়মলের পুত্র তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষী হওয়াতে, রাজকন্যা কহেন, "যদ্যপি আপনি আফগানদিগের হস্ত হইতে থোড়া উদ্ধার করিতে পারেন, আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছুক আছি, নতুবা নহি।" রাজপুত্র তাহাতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু অঙ্গীকার পূরণের পূর্ব্বেই পুরস্কার লাভের চেষ্টা করাতে, সুরতান স্বয়ং তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। পৃথিরাজ নামে রায়মলের আর এক যথার্থ বীরপুত্র ছিলেন। তিনি উক্ত শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করতঃ স্বীয় বংশের সম্ভ্রম রক্ষার্থে, থোড়া জয় করিয়া সুন্দরী তারাবাইয়ের পাণি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। পৃথ্বীরাজের যশঃসৌরভ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং সুরতান তাঁহার বীর্য্য ও সৌজন্য দর্শনে মোহিত হইলেন, এবং থোড়া জয় করিবার, অঙ্গীকার করাতেই, রাজবালা তাঁহাকে পাণি প্রদান করিতে সম্মতা হইলেন। পৃথ্বীরাজ রমণীরত্ন লাভ করিয়া ভোগসুখে নিমগ্ন হয়েন নাই। তিনি বলে ও কৌশলে আফগানদিগের হস্ত হইতে থোড়া উদ্ধার করেন। ইতিহাসে লেখে, যে তাঁহার রণপ্রিয়া ভার্য্যাও তাঁহার সঙ্গে রণস্থলে গমন করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ এই রূপে নিজ বাহুবল বিস্তার করতঃ,

তারাসন তারাবাইয়ের সহিত, পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন, এমত সময়ে সুরতানের এক অযোগ্য পুত্র ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে প্রদান করাতে, পৃথীরাজ অসন্দিগ্ধ-চিত্তে তাহা ভক্ষণ করেন এবং পথিমধ্যে প্রাণ হারান। তারা স্বামির মৃতদেহ দর্শনে নিতান্ত অধীরা হইযা, চিতা সজ্জিত করাইয়া স্বামিসহ মানব লীলা সম্বরণ করেন।

৮। রূপমতি।

ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয, যে বঙ্গ নিবাসি-গণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই রূপমতীর জীবনচরিত পাঠে আপনাদিগের মনের ঔৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, বিশেষতঃ পদ্য রচনার ক্ষমতা, তাঁহাকে ভারতীয় কামিনীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদাভিষিক্তা করিযাছে। উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী সারঙ্গ-পুরে রূপমতীর জন্ম হয়। তিনি হিন্দু ছিলেন, এই মাত্র জানা যায়, কিন্তু কোন বিশেষ কুলোদ্ভবা, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। রূপমতী সারঙ্গপু-রের এক জন প্রসিদ্ধ নৃত্যকী ছিলেন। মালবাধিপতি রাজাবাহাদুর তাঁহার অলৌকিক রূপ ও বিবিধ গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁ-হারা সাড়ে বৎসর পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়ের অকৃত্রিম

প্রেমে মোহিত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে-ছেন, এমত সময়ে (১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে) দিল্লীশ্বর আকবর মালব জয় করিবার মানসে আদম খাঁকে বহু সৈ-ন্যের সহিত প্রেরণ করিলেন। রাজা বাহাদুরও শত্রু আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সৈন্য সামন্ত একত্রিত ক-রতঃ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সংগ্রাম কালীন সৈন্যগণ তাঁহাকে সমরক্ষেত্রে একাকী রাখিয়া পলায়ন করাতে, রাজাও পলাইতে বাধ্য হয়েন। তাঁহার প্রস্থা-নের পর আদম খাঁ তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রূপমতীর আশ্চর্য্য রূপ মাধুর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া তৎসহবাস অভিলাষ করেন। রূপমতী তাহাতে কৃত্রিম সম্মতি প্রকাশ করতঃ এক নিরূপিত সময়ে আসিতে বলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তিনি অপূর্ব্ব বে-শভূষা করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; সখীগণ অনুমান করিয়াছিল, যে তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু আদম খাঁ উপস্থিত হইলে, সহচরীগণ রূপমতীকে জাগ্রৎ করিতে গিয়া দেখেন, যে তিনি বিষ পানদ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন সকলে অতিশয় শোকা-ন্বিতা হইলেন। এবং আদম খাঁ রূপমতীসহবাস সুখ-লাভে বঞ্চিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। রূপমতীর ইতিহাস কোন২ অংশে মিসরের ক্লিওপেট্রার জীবন বৃত্তান্তের অনুরূপ। কিন্তু ইহাঁর চরিত্র ক্লিও-পেটারর চরিত্র অপেক্ষা শতগুণে নির্ম্মল ছিল। রূপমতী

অনেক গুলি গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। মালববাসীগণ ঐ সমস্ত অতিশয় ভাল বাসেন। নিম্নে তাহার দুইটী গীত অনুবাদ করা গেল।

১ রজত কাঞ্চন ধন নাহিক আমার,
প্রীতিগুণে পরিপূর্ণ হৃদয় ভাণ্ডার;
সযতনে সদা তাহা রাখিয়াছি আমি,
অন্য জনে নাহি জানে বিনা মম স্বামী।
দিনেং বাড়ে তাহা হ্রাস নাহি পায,
প্রাণপতি দরশনে হৃদয় যুড়ায়।

২ শরীর পিঞ্জর মাঝে থাকি সর্ব্বক্ষণ,
প্রাণপাখী উড়িবারে করয়ে যতন।
রূপমতী মন দুখে করিছে রোদন,
হায় নৃপ, কোথা তুমি ভ্রমিছ এখন?

রূপমতী সতীত্বধর্ম্মের আর একটী দৃষ্টান্তস্থল। ইনি প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া পতিপরায়ণতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৯। দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্বরাজধানী মাহরা নগরের চণ্ডাল বংশীয়া কন্যা। তিনি অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধির নিমিত্ত বিখ্যাত ছিলেন। গোরামণ্ডল দেশের গুপ্ত রাজপুত্র, তাঁহার যশোসৌরভে মোহিত

হইয়া তাঁহাকে আপনার সুখ দুঃখের সহভাগিনী করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু চণ্ডালেরা আপনাদিগের বংশের অতিশয় গৌরব করিতেন, সুতরাং দুর্গাবতীর পিতা অসভ্য রাজপুত্রকে জামাতৃপদে বরণ করিতে প্রথমে অতিশয় সঙ্কুচিত হয়েন, কিন্তু রাজপুত্রের বিশেষ আগ্রহ দর্শনে জাত্যভিমান পরিত্যাগ করতঃ বলিয়া পাঠাইলেন, যদ্যপি পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া বিবাহ করিতে আইসেন, রূপবতী দুর্গাবতীর কর প্রাপ্তিরূপ সুখে বঞ্চিত হইবেন না। রাজপুত্র দুর্গাবতীর অসামান্য রূপগুণে এমনি অভীভূত হইয়াছিলেন, যে ইহাতেও সম্মতি প্রদান করেন, এবং পরম আহ্লাদে পঞ্চাশৎ সহস্রাধিক সৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া পাণিগ্রহণানন্তর দুর্গাবতীকে হর্ষোৎফুল্ল মনে স্বদেশে লইয় যান। তথায় কিছুকাল সুখ সচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করতঃ অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হন। দুর্গাবতী প্রাণসম স্বামীর মৃত্যুর পর সৌজন্য ও সদ্গুণে প্রজাদিগকে বশীভূত করিযা, নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিতেছেন, এমন সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরের নিষ্ঠুর সেনাপতি আজফ খাঁ অকস্মাৎ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাণী সামান্যা নারীগণের ন্যায় বিষম সঙ্কট দর্শনে হতবুদ্ধি না হইয়া অকুতোভয়ে রণসজ্জা করতঃ বহুসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে

আজফ খাঁকে দুইবার রণে পরাজয় করেন। কিন্তু যুদ্ধে তৃতীয় বার অবলা কামিনীর দ্বারা পরাভূত প্রায় হওন প্রযুক্ত, আজফ খাঁ অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাণীকে আক্রমণ করিলেন। তদ্দর্শনে রাণীর একমাত্র পুত্র সিংহের ন্যায় সাহস প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সহিত রণে নিযুক্ত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। রাণী পুত্রের ঈদৃশ শোকাবহ অবস্থা দর্শনে রণস্থল হইতে তাঁহাকে অন্তর করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাহাতে সৈন্যগণ রাজপুত্রকে রণস্থলে না দেখিয়া, শত্রুগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, ভাবিয়া অতিবেগে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেও রাণী সাহসিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণেক কাল গত হইলে হঠাৎ শত্রুপক্ষ হইতে এক তীক্ষ্ন তীর আসিয়া তাঁহার নয়নোপরি পতিত হইল, এবং তাহা বাহির করিতে না করিতেই আর একটী তীর তাঁহার গলদেশ বিদ্ধ করাতে তিনি মৃতকল্পা হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে পতিতা হইলেন। জনৈক বিশ্বাসী ভৃত্য, চরমকাল সন্নিকট বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে রণস্থল হইতে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু রাণী তাহাকে নিষেধ করতঃ খর্গাঘাতে আপনার প্রাণনাশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। স্নেহ পরায়ণ ভৃত্য এরূপ নিদারুণ কার্য্যে অসম্মত হওয়াতে, রাণী বল পূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে

খড়্গ গ্রহণানন্তর নিজ গলদেশে আঘাত করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। অদ্যাপি রাজস্থানের লোকেরা দুর্গাবতীর যশঃগান করিয়া থাকে। দুর্গাবতী বস্তুতঃ একজন বীরাঙ্গনা ছিলেন।

২০। যদু বাই।

যদু বাই মরুদেশের অধিপতি মল্লদেবের দুহিতা ও উদয় সিংহের সহোদরা ছিলেন। উদয় সিংহ সম্রাট্ আক্‌বরের ক্রোধানল নির্ব্বাণমানসে ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জাত্যভিমান পরিত্যাগ করতঃ নিজ ভগিনী যদু বাইকে আকবরের হস্তে সমর্পণ করেন। বোধ হয়, হিন্দুদিগের সহিত ও মুসলমানদিগের এই প্রথম বিবাহ। ইহদ্বারা হিন্দুদিগের বিস্তর উপকার সাধিত হইয়াছিল। যদু বাই আপনার অলৌলিক সৌন্দর্য্য ও বিবিধ সদ্‌গুণে সম্রাটকে অতি অল্পকাল মধ্যে বশীভূত করিয়া প্রধান রাজ্ঞী হয়েন। বিবাহের কিঞ্চিৎ পরে আক্‌বর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া নয়ন মন সন্তৃপ্ত করণাভিলাষে সস্ত্রীক আজমিরের মইনুদ্দিন নামে বিখ্যাত মস্‌জিদে পদব্রজে গমন করেন। পাছে মহিষীর কোমল চরণতলে আঘাত লাগে, এই নিমিত্ত পথোপরি গালিচা বিস্তারিত করাইয়াছিলেন, এবং কেহ যেন তাঁহার মুখপদ্ম না দেখে, এই জন্য পথের দুই পার্শ্বে বস্ত্রের কাণ্ডার দেওয়া হইয়াছিল। সম্রাট্

এই রূপে তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রের জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করেন, এবং রজনীতে স্বপ্নযোগে ফতে-পুর শিকরি নিবাসী এক বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট গমন করিতে আদিষ্ট হন। ঐ ধার্ম্মিক মুসলমানের নাম সে-লিম। আকৃবর পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করেন, তাহাতে উক্ত ব্যক্তি বলেন, যে রাজ্ঞী অতি শীঘ্রই এক পুত্র প্রসব করিবেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মহিষী স্বস-ত্ত্বাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সম্রাট্ বৃদ্ধের কুটীরের সন্নিকটে গৃহ প্রস্তুত করাইয়া যে পর্য্যন্ত চিরবাঞ্ছিত অপত্য মুখারবিন্দু দর্শন না করেন, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সময়ে পুত্র ভূমিষ্ট হইলে ঐ বৃদ্ধের নামানুসারে তাঁহার নাম "সেলিম" রাখিলেন। ইনিই পরে "জাহাঙ্গির' অর্থাৎ "জগৎজেতা" নামে বিখ্যাত হন। যদু বাই হিন্দু হইয়া মুসলমান স্বামীর সহিত কি রূপ ব্যবহার করি-তেন, যদিও আমরা তাহা নিশ্চয় করিতে অক্ষম, তথাচ তাঁহাদের প্রণযের পরিচয় পাইয়া আমাদের আহ্লাদ জন্মে। মনুষ্য জাত্যভিমান পরিত্যাগ করতঃ ভিন্ন জাতির সহিত আদান প্রদান করিলে যুদ্ধ কলহানল নির্ব্বাপিত ও ক্রমে সকল জাতিরি মিলন ও অধিক-তর বলবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। বোধ হয়, আকৃবর এই অভিপ্রায়েই যদু বাইয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। ১৬৮০ শকের প্রারম্ভে রূপবতী যদুবাই মানবলীলা সম্বরণ করেন, এবং তাঁহার অদর্শনে আকবর এরূপ খেদান্বিত হইয়াছিলেন, যে রাজ্যের সমস্ত লোককে ঐ উপলক্ষে দুঃখ প্রকাশ করিতে অনুরোধ ও রাণীর নাম চিরস্মরণীয় করণাভিলাষে তাঁহার কবরের উপর একটী মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। আক্ষেপের বিষয় এই, তাহা ইংরাজদিগের দ্বারা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। যদুবাই হিন্দু হইয়াও যে মুসলমান রাজার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধা হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার প্রকৃত চিত্তমহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

২১। অহল্যাবাই।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে অনেক প্রধান লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুরুষত্ব ও রাজোচিত অন্যান্য গুণে শিবজীর নাম যেমন বিখ্যাত, অহল্যাবাইও তদ্রূপ গুণবতী স্ত্রীগণের মধ্যে সম্ভ্রান্তা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাধুচরিতা বুদ্ধিমতী রমণী ভারতবর্ষ বহুকাল দেখেন নাই। সীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রমণীগণ ভারতের অলঙ্কারস্বরূপা ছিলেন বটে, কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবিত নায়িকা শাসনবুদ্ধি, ধীরতা, মহানুভাবকতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের দৃষ্টান্ত স্থল।

কোন্ বিশেষ বংশের নিকট আমরা এই অদ্ভুত

কামিনীর জন্য কৃতজ্ঞ হইব, তাহার স্থিরতা নাই। এই মাত্র জানা আছে, সিন্ধিয়া বংশের কোন গৃহস্থের বাটীতে ইহাঁর জন্ম হয়। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে রাণী অহল্যাবাইয়ের চরিত্রের কোন অংশ প্রকাশিত নাই। সুতরাং কিরূপ শিক্ষায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছিল, কি প্রকারে তাঁহার ধর্ম্মানু-রাগ তাদৃশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কি রূপেই বা তাঁহার ঔদার্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদারাত্মাদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল, তাহার কিছুই আমরা অবগত নহি। যৌবনকালেই তাঁহার মহৎগুণ প্রকাশিত হয়। বহুল সুশিক্ষা ব্যতিরেকে সে সকল গুণের তাদৃশ পক্বতা হ-ইতে পারে না। অনুমান হয়, তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন নাই, কারণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু তিনি পণ্ডিতদিগের মুখে পুরাণ শা-স্ত্রের অনেকাংশের ব্যাখ্যা শ্রবণ এবং পুরাণোক্ত সাধ্বী কামিনীগণকে নিজচরিত্রের আদর্শ করিয়াছিলেন।

অহল্যা মহারাজ মুলহর রাও হোলকারের পুত্র-বধূ। মুলহর রাওর কুন্দরাও নামে যে একমাত্র বংশধর ছিলেন, ইনি ইহাঁর পরিণেতা। কুন্দরাও পিতার বর্ত্তমান অবস্থাতেই একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অভাগিনী অহল্যা বিধবা হইলেন; এখনও তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হয় নাই, তথাপি তিনি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কঠোর বৈধব্যব্রতাচরণ

করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহার, পরিচ্ছদ এবং আচরণে বিলাসের লেশমাত্র ছিল না।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মুলহর রাওর মৃত্যু হইল। সুতরাং অহল্যার পুত্র রাজা হইলেন, রাজকুমার অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই, অল্প দিন পরে তাঁহারও মৃত্যু হয়।

এই বিভ্রাটে নর্ম্মদা তীরস্থ সমস্ত হোলকার রাজ্য শোকাতুরা অহল্যার হস্তে ন্যস্ত হইল। তাঁহার কন্যা মুচা বাই রাজ্যের কোন অধিকার পাইলেন না। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অহল্যাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাহাতে রাণী একটী পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন, মন্ত্রী গঙ্গাধর রাও যশোবন্ত এরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অহল্যা মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়াতে, তিনি আপন অভীষ্ট সাধন জন্য অন্যায় উপায় অবলম্বন করিলেন। পেষোয়ার সেনাপতি রাঘবকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিলেন; কিন্তু হোলকার সৈন্যগণ রাণীর পক্ষে স্থির থাকিল। বুদ্ধিমতী রাণী আপন স্থিরাভিসন্ধি রাঘবকে জানাইয় বলিলেন, "স্ত্রীলোকের সহিত দ্বন্দ্ব করায় মহাশয়ের লজ্জা ও অসম্মান ভিন্ন আর কিছু লাভেরই সম্ভাবনা নাই। বিধবাকে পরাজিতা এবং রাজ্যভ্রষ্টা করিলে মহাশয়ের কি যশের সম্ভাবনা আছে? আর যদি আপনি পরাজিত হয়েন, মহাশয়কে দ্বিগুণ অপমানগ্রস্ত ও

লজ্জিত হইতে হইবে। অতএব ক্ষান্ত হউন।” রাণী মন্ত্রীকে ভৎ র্সনা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, উদ্যোগসহকারে সেনা সুসজ্জ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। সুতরাং রাঘব নিবৃত্ত হইলেন।

হোলকার ভারতবর্ষের একটী সুবিস্তীর্ণ রাজ্য, প্রজার সংখ্যা অল্প নহে। রাজক্ষমতারও সীমা ছিল না। ২০ বৎসর বয়স্কা এক রমণীর হস্তে ঈদৃশ গুরুভার অর্পিত হইলেও এই বুদ্ধিমতী সদাশয়া ভামিনী উপযুক্ত রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া ভাণ্ডারস্থ সমস্ত ধন বিধিপূর্ব্বক দেব সেবায় ও অন্যান্য সৎকর্ম্মে উৎসর্গ করিতেন। ভারতের প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র সকলে তাঁহার নির্ম্মিত মন্দির তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের সাক্ষ্য দিতেছে। কাশীর বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির তাঁহার নির্ম্মিত। গয়ার শিবমন্দিরও তাঁহার। এতদ্ভিন্ন সেতুবন্ধ হইতে কাশী পর্য্যন্ত সকল তীর্থ স্থানেই তাঁহার অতিথিশালা স্থাপিত ছিল।

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই অহল্যা সাধারণ সমৃদ্ধির গূঢ় উপায় সকল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ক্ষমা করিলে যে শত্রুকে পুত্রতুল্য বশীভূত করা যায়, ইহা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার কৃপায় বিরোধি মন্ত্রী যশোবন্ত পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শত্রুর উৎপীড়ন হইতে রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত টুকাজি

হোলকার প্রধান সেনানী নিযুক্ত হইলেন। টুকাজি অ-হল্যাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন। রাণীর প্রতি তাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা ছিল, যে দ্বাদশ বর্ষ দূরদেশে থাকিলেও তাঁহার মন কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অহল্যা তাঁহার এই সাধুতার যথেষ্ট পুরস্কার করিয়াছিলেন। টুকাজির পরিবারের প্রতি তাঁহার দয়া অচলা ছিল।

মালবার প্রদেশ তিনি স্বয়ং শাসন করিতেন। তাঁ-হার শাসনে প্রজাগণ সন্তুষ্ট ছিল। অল্প করেই তা-হাদের মহারাণীর যথেষ্ট হইত। শাসন কার্য্যের উপ-যুক্ত ব্যয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, অতিথি সেবা, প্রাসাদনির্ম্মাণ ইত্যাদি কর্ম্মে ব্যয়িত হইত। বর্ত্ত-মান ইন্দোর নগর তাঁহার নির্ম্মিত। বোধ হয়, দরিদ্র-দিগকে দয়া করিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেন। দরিদ্রেরা রাণীর সদাব্রতে সর্ব্বদা অন্নপান প্রাপ্ত হইত। গ্রীষ্মকালে ঐ সকল অঞ্চলে জলাভাব বশতঃ পথিকদিগের বিশেষ কষ্ট হয় : দয়া-বতী রাণী বহু সংখ্যক জলচ্ছত্র স্থাপন করিয়া সেই কষ্ট এককালে দূর করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সকল কর্ম্মেই দয়া প্রকাশ পাইত।

তাঁহার শাসনপ্রভাবে প্রজাগণকে শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে হয় নাই। সীমাস্থিত রাজগণ রাণীর সাধু গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাঁহার গুণে বশীভূত ছিল। দুর্দ্দান্ত টিপুও

কখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই। আমরা শুনিতে পাই, উদয়পুরের রাজা একবার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই।

অহল্যা বিশেষ পরিশ্রমসহকারে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিতেন। পূজা, শাস্ত্র শ্রবণ, ভিক্ষাদান, প্রভৃতি কর্ম্মে দুই প্রহর অতীত হইত। পরে আহারান্তে ২ টার সময় দরবারে যাইয়া যাহার যে আবেদন, স্বয়ং শ্রবণ করিতেন। তৎপরে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ৯ টার পর ১১ টা পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার দরবার হইত। এই নিয়মে তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

অহল্যা স্বয়ং দরবারে যাইতেন, ইহা শুনিয়া আমাদের বিস্ময় জন্মে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। তথাকার স্ত্রীলোকরা বঙ্গমহিলাগণের ন্যায় অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকেন না। এমন কি, অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না; রাজকার্য্যেও তাঁহাদের অধিকার আছে।

অহল্যা প্রবীণাবস্থায় শোক পান। অকস্মাৎ তাঁহার জামতার কাল হইলে মুচাবাই সহমৃতা হইবার জন্যে তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অহল্যা অগত্যা সম্মতি দিলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত কাতরা

হইলেন, তিনি ৬০ বৎসর বয়সে দেহ লীলা সম্বরণ করেন।

অহল্যার চরিত্র অদ্ভুত। নিজ ধর্ম্মে ইহাঁর বিশ্বাস অচল ছিল। বিরোধিদিগের প্রতি ইহাঁর কিছুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নাই। দয়াই ইহাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ অধিকার করিয়াছিল। এই রূপ অন্তঃকরণে ইনি যে২ কাজ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা রাজ্যের কোন হানি হয় নাই বরং অনেকেরই উপকার হইয়াছিল। যদিও ইনি স্ত্রীলোক ছিলেন, তথাপি ইহাঁর কার্য্যে গৌরবাকাঙ্ক্ষা কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশংসাসূচক এক খানি পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলে, তিনি সেই পুস্তক নর্ম্মদায় নিক্ষেপ করিতে বলেন। জগতে এরূপ স্ত্রীলোক অতি বিরল। ইনি যদি বীরাঙ্গনা না হন, তবে কে সেই বিশেষণের যথার্থ অধিকারিণী, বলিতে পারি না।

২২। কৃষ্ণকুমারী।

আমরা এক্ষণে কৃষ্ণকুমারীর চিত্ত বিদারক জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি ৭৯২ অব্দে উদরপুরের রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও মাধুর্য্য প্রযুক্ত তিনি রাজস্থান নিবাসিগণের পরম স্নেহপাত্রী হইয়াছিলেন। যোধপুরাধিপতি প্রবল প্রতাপ ভীম সিংহের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হয়।

কিন্তু সেই হতভাগ্য রাজকুমার অকালে কালের করাল করে নিপতিত হইয়া,জগত বিখ্যাত কৃষ্ণকুমারীর পাণি গ্রহণ সুখে বঞ্চিত হন। তৎপরে জয়পুরের রাজা কৃষ্ণকুমারীর সহিত আপন বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহার দূত উদয়পুরে উপস্থিত হইতে না হইতেই মারবার রাজা কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাঁহারা উভয়েই অভিলাষ সম্পূর্ণ না হইলে সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সুতরাং কৃষ্ণকুমারীর পিতা মহা শঙ্কটে পতিত হয়েন।

এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কেবল একমাত্র উপায় ছিল। মন্ত্রিগণ রাজাকে সেই নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্য ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে বারম্বার অনুরোধ করেন; কিন্তু প্রথমে তিনি ঐ সকল পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে সম্মত হন নাই। পরে যখন দেখিলেন যে কৃষ্ণকুমারীর করাকাঙ্খী নৃপতিদ্বয় যথার্থই অসংখ্য সৈন্য লইয়া উদয়পুর আক্রমণ করিতে অসিতেছেন,তখন তিনি আর ক্ষান্ত থকিতে না পারিয়া আপনার এক কুটুম্বকে কৃষ্ণকুমারীর প্রাণসংহার করতঃ রাজ্য রক্ষা করিবার অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই শান্ত স্বভাব রাজপুত্র এরূপ নিদারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া পলায়ন করেন। পরে রাজা আর এক ব্যক্তিকে ঐ শোচনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। সেই ব্যক্তি কৃষ্ণকুমারীর

সম্মুখে উপস্থিত হওতঃ তাঁহার কোমল কান্তি দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া হস্ত হইতে খড়্গ দূরে নিক্ষেপ করতঃ শোকপূর্ণ হৃদয়ে সজল নয়নে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অবশেষে রাজা কন্যার নিকট বিষ প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী তাহা আহ্লাদের সহিত পান করিলেন। তাঁহার মাতা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিলাপ করিলে কৃষ্ণকুমারী কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমা জননি! কি জন্যে অকারণ শোক প্রকাশ করিতেছেন। আমরা ত রাজ পুত্রকন্যা, ভূমিষ্ঠ হই-বামাত্র আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। পিতা যে আমাকে এ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ করা উচিত। আমি আপনার কন্যা, আমি কি মৃত্যুকে ভয় করিব? বিশেষতঃ আমার এই অসার দেহভার পরিত্যাগ করিলে যদি পিতার রাজ্য ও মান সম্ভ্রম রক্ষা হয়, তাহা কি করা উচিত নয়?" কৃষ্ণকুমারী এইরূপ কহিতে কহিতে ভূতলে পতিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচা-রিত হইলে হাহাকার শব্দে রাজ স্থান পরিপূর্ণ হইল। ইনি যথার্থই বীরাঙ্গনা ছিলেন।

২৩। রাণী ভবানী।

রাণী ভবানী রাজসাহীর অন্তঃপাতী ছাতিম গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। তিনি অতি সুন্দরী

ও সুলক্ষণা ছিলেন ; এই জন্য নাটোরের ভূম্যধিকারী রাজা রামজীবন রায় আপন পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, রাণী ভবানী বিদ্যাবতী ছিলেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া এমত বোধ হয় না যে তিনি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

তিনি বাল্যকালাবধি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দেব পরায়ণা ছিলেন, এবং সেই সংস্কার প্রযুক্ত শ্বশুরের লোকান্তর প্রাপ্তির পর কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও পরোপকারে নিযুক্ত থাকিতেন ; সেই জন্যই তাঁহার এত খ্যাতি।

রাণী ভবানী যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া ঐ সকল সৎকর্ম্ম করেন, তাহা জিলা রাজশাহীর অন্তর্গত রাজা রামজীবন রায়ের স্বোপার্জ্জিত। অতি আশ্চর্য্য প্রকারে তিনি রাজত্ব প্রাপ্ত হন। কামদেব নামক একজন ব্রাহ্মণের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম রঘুনন্দন ও কনিষ্ঠের নাম রামজীবন। রঘুনন্দন আপন বুদ্ধিকৌশলে মুরসিদাবাদের নবাবের অতি প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁহারই সাহায্যে রামজীবন নবাবের নিকট হইতে অনেক জমীদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, রাণী ভবানীর স্বামী রাজা রামকান্ত পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন এবং সৎকার্য্যে ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিয়া অতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করেন।

রাণী ভবানী অতিশয় পতিপ্রাণা ছিলেন। কথিত

আছে, রাজা রামকান্ত এক দিন ক্রোধপরবশ হইয়া দয়া রাম নামক এক অতি সুবুদ্ধি বিচক্ষণ দাসকে বাটী হই-তে বহিষ্কৃত করিযা দেন। ঐ ব্যক্তি রাজা রামজীবনের সময়াবধি বাটীর কর্ত্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং রাজা তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না। সুতরাং তাঁহার পুত্রের অসদ্ব্যবহারে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া নবাবের সভায় গমন করিলেন। নবাব তাঁহার পরামর্শে রাজা রামকান্তের সমস্ত জমী-দারী কাড়িয়া লইলেন। তাহাতে রামকান্ত অনেক অনুনয় বিনয় করাতে, নবাব কহিলেন, পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দিলে তোমার জমীদারী পুনরায় পাইতে পার। ইহা শুনিয়া রাণী ভবানী আপন অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা দিলেন ও তদ্দ্বারা রামকান্ত অপহৃত জমী-দারী পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা রামকান্ত প্রায় ১৬ বৎসর রাজ্য ভোগ ক-রিয়া ১১৫৩ সালে পরলোক গত হয়েন। যখন রাম-কান্ত রাজ্যচ্যুত হয়েন, রাণীভবানী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ঐ গর্ভে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হয়। ইহার পর তাঁ-হাদের আর এক পুত্র ও কন্যা জন্মে। পুত্র দুইটী বাল্যকালেই নষ্ট হয়। কন্যা তারাঠাকুরাণী নামে বি-খ্যাত ছিলেন।

রাজা রামকান্তের লোকান্তর গমনের পর রাণী-

ভবানী সমুদায় ঐশ্বর্য্য আপন হস্তে পাইয়া, দান ও পুণ্য কর্ম্মে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্তহস্ত হন। কিন্তু যে সকল কীর্ত্তির জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে, তখন পর্য্যন্তও তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। কন্যার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিলে তাহাকেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিবেন, তাঁহার এমত অভিলাষ ছিল। কিন্তু জামাতার অকাল মৃত্যু বশতঃ সে আশায়ও নৈরাশ হইলেন।

কথিত আছে, রাজকন্যা তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপের বিবরণ শুনিয়া মুরসিদাবাদের নবাব তাঁহাকে হরণার্থ একবার অনেক সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতার অন্নে প্রতিপালিত কৌপীনধারী মোহন্তগণ তাহাতে কুপিত হইয়া এক হস্তে ঢাল ও অপর হস্তে করবাল লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওয়াতে নবাব কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই অবধি রাণী তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন, কোন স্থানে যাইতে দিতেন না। যবন রাজাদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের জন্য বিশিষ্ট লোকের কন্যা ও পুত্রবধরা গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না।

রাণীভবানী জামাতার মরণান্তে একেবারে বিষয়াদির মায়া পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দানশীলতার বিবরণ শুনিলে অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়। কত দরিদ্রেরই

যে তিনি উপকার করিযাছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

রাণীভবানী ৩২ বৎসর বয়সে পতিহীনা হইয়া ৭৯ বৎসরে পরলোক গমন করেন। তিনিও অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এমত সামর্থ্য ছিল যে নিত্য পূজাদি করিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন, একদিনের জন্যেও এ নিয়মের অন্যথা করেন নাই।

রাণীভবানী জামাতার পরলোকান্তে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ঐ পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। তাঁহার বয়ঃ-প্রাপ্তির পর, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বাধিকারী করিয়া গঙ্গা-তীরে বাস করিতেন ; বিষয় কর্ম্ম কিছুই দেখিতেন না। রাজা রামকৃষ্ণও অত্যন্ত ধর্ম্মপরাযণ ছিলেন। রাজ-কর্ম্মে বৈরাগ্য প্রযুক্ত তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার অনেক বিষয় নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ দোষ ছিল না। তিনি যে সকল পুরাতন কর্ম্মকা-রকদিগকে বিষয়ের রক্ষক করিয়াছিলেন, তাহারাই ভক্ষক হইয়া ঐ সকল সম্পত্ত্যাদি কলে কৌশলে আপ-নারাই গ্রাস করে। সম্প্রতি ঐ সকল লোকের বংশ রাজশাহী জিলার প্রধান২ জমীদার হইয়াছেন। এবং যে রাণীভবানীর কীর্ত্তি ভারত ভূমিতে জাজ্বল্যমান, ও যাঁহার অন্নে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইত, এক্ষণে তাঁহার পরিবারস্থেরা সামান্য লোকের মধ্যে গণনীয় হইয়াছেন।

সমাপ্ত।